শিল্পীই স্বীকার করেন।''

১৯২৮ সালে 'বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী (১৯৬৮-১৯৪৬) নজরুলের বক্তব্যের কিছুটা সমালোচনা করেন।

১৯২৮ সালে 'বঙ্গসাহিত্যে খুনের মামলা' প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) নজরুলের বক্তব্যের কিছুটা সমালোচনা করেন। কিন্তু মূল বক্তব্যের সঙ্গে একমত হন ''বাংলা সাহিত্য থেকে আরবি ও ফারসি শব্দ বহিষ্কৃত করতে সেই জাতীয় সাহিত্যিকরাই উৎসুক যাঁরা বাংলা জানেন না।''

ইসলামি এমন কোনো আচার অনুষ্ঠান নেই যা নিয়ে নজরুল কাব্যরচনা করেননি। অনুষ্ঠানের ব্যবহারিক দিকগুলোও সুষমভাবে ফুটে উঠেছে। দুই ইদ নিয়েই নজরুল গান, নাটক, কবিতা, গজ়ল, গীতিবিচিত্রা লিখেছেন। 'ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এলো খুশির ইদ।' এক সময় গানটি বাংলার আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে দিয়েছে। এর একটা ছোটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। আব্বাসউদ্দিন তখন রীতিমতো প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। ইদের সময় মুসলমান ঘরানার গান করতে চান। নজরুলকে ধরেন গান লেখার জন্য। নজরুল রাজি হননি। কারণ—কেউ এ গান রেকর্ড করবে না। আব্বাস প্রথম বছর এইচ এম ভি-কে রাজি করাতে পারেননি। অনেক কষ্টে দ্বিতীয়বার রাজি করান। নজরুল লিখলেন আগের গানটি। আব্বাসউদ্দিনের গলায় গাওয়া। মাত্র ১০০ কপি নাকি রেকর্ড হয়েছিল। প্রথম দিনে দাবি এসেছিল কয়েক হাজার। এইচ এম ভি-র মূল অফিস পর্যন্ত মানুষ ধাওয়া করেছিল রেকর্ডটি কেনার জন্য। এখন তো সে সব ইতিহাস।

১৩২৭ বঙ্গাব্দে প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র' পত্রিকায় তারিকুল আলম বলে একজন 'আজ ইদ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখলেন। তাতে ইদ-উজ-জোহা'তে পশু কোরবানি-র বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। ঝল্‌সে উঠলো নজরুলের কলম—'ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ সত্যের উদ্বোধন'। তারিকুলকে কেউ মনে রাখেনি। কিন্তু নজরুলের 'কোরবানি' অমরত্ব পেয়ে গেছে। 'কৃষকের ঈদ' বলে একটি কবিতার দু-টি লাইন—

> জীবনে যাদের হররোজ রোজা ক্ষুধায় আসে না নিদ
> মুমূর্ষু সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কি আজ ইদ?

কবিতায় তীব্রতা প্রকাশ পেয়েছে যেমন, মমতা তেমনই। গ্রামীণ মুসলমানদের জীবন জানতেন নজরুল। অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটে তাদের। ইদ মানে তো খুশির দিন। সেই নিরন্ন মানুষগুলোর জীবনে কোনো বার্তা বয়ে আনছে রোজাশেষে ইদ সেটাই তাঁর জিজ্ঞাস্য।

আগেই জাকাত দেবার কথা বলেছি। অসহায় আতুর নিরন্ন মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার একটা মাধ্যম জাকাত। নজরুল 'জাকাত' কবিতায় আশ্চর্য ব্যঞ্জনায় ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর অভিব্যক্তি—

> জাকাত লইতে আশমানে এল আবার ডাকাত চাঁদ
> গরিব কাঙাল হাত পাত, ধনী রইস সবাই বাঁধ।

নজরুল চেয়েছিলেন মানুষের জাগরণ, ভারতবাসীর জাগরণ, বাঙালির জাগরণ। ইসলামি কবিতায় নজরুলের ইচ্ছা ছিল বাঙালি মুসলমানের জাগরণ। দৈনিক 'আজাদ'-এর ১৩৪৭-এর ইদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'আজাদ' কবিতায় ইদের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার আরাধ্য মিশে গেছে—

> আজিও তেমনি জমায়েত হয় ইদগাহ মসজিদে,
> ইমাম পড়েন খোৎবা, শ্রোতার আঁখি ঢুলে আসে নিদে।
> যেন দলে দলে কলের পুতুল শক্তি শৌর্যহীন,
> নাইকো ইমাম, বলিতে হইবে—ইহারা মুসলেমিন।

তাঁর ইদের কবিতা গানে আছে আনন্দময়তা, সাম্যবাদ এবং সৌন্দর্যের বুনুনি। বাঙালি মুসলমান তো বটেই সমগ্র বাঙালি নজরুলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে এই কাজের জন্য। আমাদের সাহিত্যকে তিনি এভাবেই বিশ্বমর্যাদার উচ্চস্তরে নিয়ে গেছেন।

কাজী আব্দুল ওদুদ মুক্তচিন্তার মানুষ ছিলেন। 'বুদ্ধিমুক্তি'র আন্দোলন করেছিলেন। 'শিখা' পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান সমাজের কাছে তা ছিল অত্যন্ত আনন্দের খবর। বিরোধিতাও কম হয়নি। 'ইদুল-ফিতর' শিরোনামে প্রবন্ধে লিখলেন কাজী আব্দুল ওদুদ : ''সর্বপ্রকার জড়তা থেকে মুক্ত হয়ে মানুষ যোগ্যভাবে ধর্মপালন করুক, পালন করে সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ লাভ করুক, ইদুল ফিতরের পুণ্য দিনে এই প্রার্থনা করি।''

বেশ কিছুদিন আগে আমার একটা প্রবন্ধে বলেছিলাম মুসলমানদের জীবনে আনন্দউপকরণ খুবই কম। ধর্মীয় অনুষ্ঠানও কম। কিন্তু আনন্দ ছাড়া, ভালোবাসা ছাড়া মানুষ তো বাঁচতে পারে না। মুসলমানরা বিশ্বাস করেন আল্লাহ এক এবং মহম্মদ তাঁর প্রেরিত পুরুষ। সেই আল্লাহ এবং মহম্মদ (সঃ)-এর সঙ্গে তো মুসলমানের ভালোবাসার সম্পর্ক। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় সামান্য উপকরণগুলিও আনন্দময় হয়ে উঠুক।

১৯২০ খ্রিস্টাব্দে নজরুল দৈনিক 'নবযুগ'-এ একটি প্রবন্ধ লেখেন 'বাংলা সাহিত্যে মুসলমান' নামে। মুসলমানদের করণীয় কী তা বলেছিলেন—

> আমাদের বাঙলার মুসলমান সমাজ যে বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে আশাতীতভাবে উন্নতি দেখিয়াছেন, ইহা সকলেই বলিবেন, এবং আমাদের পক্ষে ইহা কম শ্লাঘার বিষয় নহে।... এখন আমাদের বাংলাসাহিত্যে স্থায়ীপ্রভাব বিস্তার করিতে হইলে, সর্বপ্রথম আমাদের লেখার জড়তা দূর করিয়া তাহাতে ঝরনার মত ঢেউ ভরা চপলতা ও সহজ মুক্তি আনিতে হইবে।... নবীন সাহিত্যিকগণ সর্বদা প্রফুল্ল চিত্তে থাকিবার জন্য যদি এক আধটু করিয়া সংগীতের আলোচনা করেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাহাদের লেখার মধ্যে এই সংগীত, সুরের এই ঝংকার উন্মুক্ত প্রফুল্ল চিত্তের এই মোহন-বিকাশ ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাদের লেখার মধ্যে এক নতুন মাদকতা, অভিনব শক্তি দান করিতেছে।

কাজী মোতাহার হোসেন (১৮৯৭-১৯৮১) তাঁর বিখ্যাত 'আনন্দ ও মুসলমান-গৃহ' প্রবন্ধে চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন—

> মুসলমানের যে গৃহ নেই, তার একটি কারণ, আনন্দের উপকরণের অভাব। মুসলমান গান গাহিবে না, ছবি আঁকবে না; এক কথায় মনোরঞ্জনকর ললিতকলার কোন সংশ্রবেই থাকবে না। মুসলমান পুরুষরা কেবল কাজ করবে, আর ঘর শাসন করবে, মেয়েরা কেবল রাঁধবে, বাড়বে, আর বসে বসে স্বামীর পা টিপে দেবে...।... গৃহে যখন আমাদের থাকতেই হবে তখন আমরা এর সংস্কারে লেগে যাই না কেন? সমাজকে যখন আমরা বাদ দিতে পারি না, তখন একে সরস শোভন এবং আনন্দময় করেই গড়ে তুলিনা কেন?
>
> (সওগাত, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪)

জীবন এবং সমাজ 'আনন্দময়' করে তোলাটাই প্রধান কাজ। মুসলমানদের ধর্মীয় ও অন্যান্য উপাচারগুলি সাহিত্য সংস্কৃতির মাধ্যমে জারিত হতে অনেক সময় লেগেছে। এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি। কয়েক শো বছর ধরে মুসলমান ইদ পালন করে আসছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইদ নিয়ে সত্যিকারের সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছে। কাজী নজরুল দুই ইদ তথা ধর্মীয় উপাচারগুলিকে অসাধারণ সৌন্দর্য্য ও তাৎপর্যে মণ্ডিত করে এক যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন।

একবিংশ শতাব্দীতে আমরা প্রবেশ করেছি। একথা অবশ্যই বলা যায় ইদ ধর্মীয় উৎসব তো বটেই, আজ সাংস্কৃতিক, সামাজিক অনুষ্ঠানেও পরিণত হয়েছে, আমাদের পরিবার, সমাজ ও সাহিত্যকে কিছুটা হলেও আনন্দময় করে তুলেছে।

With best compliments of

DURGAPUR SAW MILL

TIMBER MERCHANTS & GENERAL ORDER SUPPLIERS

G. T. Road (Main Gate), P.O. Durgapur-713203, West Bengal
Phone : 0343 2585184, 6452480, Mobile : 9832163188

Sl. No. 136

ঝুমুর গানের প্রাচীনত্ব, ভাষা ও বিষয়বৈচিত্র্য

অশোক দাস

ঝুমুর গান নিয়ে ইদানীং বিস্তর আলোচনা হচ্ছে। বর্তমান নিবন্ধের লেখকও ঝুমুর গানের বিভিন্ন দিক এবং বিভিন্ন পদকর্তার রচনারীতি গায়নবৈচিত্র্য নিয়ে বিভিন্ন পত্রিকায় আলোচনা করেছেন। তবুও ঝুমুর সম্পর্কে অনেক না-বলা কথা রয়ে যাবে। কারণ, ঝুমুর গান গাওয়া হয় যে অঞ্চলে সে অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিসীমা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিহারের রাজমহল পাহাড়ের সানুদেশ থেকে শুরু করে পূর্ণিয়া, বীরভূম, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, সিংভূম, রাঁচি অতিক্রম করে এর চৌহদ্দি চলে গেছে সেরাইকেলা, কেওনঝড়, বালেশ্বর পর্যন্ত। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল একদা অরণ্যাবৃত ছিল, অরণ্যের মাঝেমাঝে তখনও জনপদ ছিল, পাশ দিয়ে এখনো বয়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী, অজয়, দামোদর, দারকেশ্বর, গন্ধেশ্বরী, কংসাবতী, শিলাবতী, সুবর্ণরেখা সহ বহু নাম-না-জানা ছোটো বড়ো পার্বত্য নদী, আর আছে মালঞ্চ, গুমরু, দুমকা, ফুলঝুরি, বোদমা, পঞ্চকোট, জয়চণ্ডী, দলমা, পরেশনাথ সহ ছোটো বড়ো অজস্র পাহাড়, টিলা, টিকর। ভাষারও বৈচিত্র্য যেমন আছে, তেমনি আছে জীবনযাত্রা নির্বাহের বৈচিত্র্য। এ অঞ্চলে ছোটো বড়ো অনেক রাজা লর্ড কর্নওয়ালিশ কেন শের শাহ-এর জমানার বহু আগে থেকেই দাপটে রাজত্ব করেছেন দীর্ঘদিন, নিজেদের উপর ক্ষত্রিয়ত্ব আরোপ করার জন্য বংশের ইতিহাসের সাথে জুড়ে দিয়েছেন নানা লৌকিক কাহিনি। অনেক রাজা মাটির দেওয়াল খাপরার ছাউনি দেওয়া রাজপ্রাসাদে বাস করে রাজকীয় মর্যাদায় সংস্কৃতি চর্চা করেছেন, যার প্রধানতম অঙ্গ হলো ঝুমুর গান। যার পদকর্তা বা শিল্পী অধিকাংশই বাঙালি।

ঝুমুর গান যে কত প্রাচীন তা নিয়ে এখনো মীমাংসা হয়নি। 'সঙ্গীত দামোদর' গ্রন্থে ঝুমুরের উল্লেখ আছে। গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই গ্রন্থে সেই গানকেই ঝুমুর গান বলা হয়েছে, যার মধ্যে আছে আদিরসের প্রাবল্য, দ্রাক্ষারসজাত মদিরার মতো মাদকতা, এবং বর্ণাদির মতো বাঁধা-নিয়মের অভাব। যে শ্লোকে ঝুমুরের এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, সেই শ্লোক 'ঝুমুরী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মানভূম ও তৎসংলগ্ন জেলাগুলির ঝাড়খণ্ড উপভাষাভাষীরা এই গানকে বলেন, 'ঝুমৈর'। নিমানন্দ দাসের একটি পদে আছে—'চরণে চরণ বেড়া ত্রিভঙ্গ হইয়া/ঝুমরি গাইছে শ্যাম বাঁশরি বাজায়া।।'

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে 'ঝুমুর'-এর পরিবর্তে 'ঝুমরি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। কোথাও কোথাও 'ঝুমর' শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। 'মানভূমের ঝুমুর' গ্রন্থের রচয়িতা ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায়-এর মতে ঝুমুর নাচ নয়, সুর নয়, ঝুমুর একপ্রকার গান। তাই এই গানের সাথে বিভিন্ন ধরনের নাচ প্রচলিত আছে, বিভিন্ন অঞ্চলের গায়কগণ বিভিন্ন সুরে ঝুমুর পরিবেশন করে থাকে। নিমানন্দ দাসের গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে 'ঝুমুর' গানের আভিজাত্য এতই প্রবল ছিল যে ১১৭১ বঙ্গাব্দেও বৈষ্ণব-পদসংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব দেখা যাচ্ছে আজ থেকে প্রায় আড়াইশো বছর আগেও বৈষ্ণব কবিগণ ঝুমুর গান রচনা করেছেন। ঝুমুর গানে রাধাকৃষ্ণবাদ যে কতদিন আগে এসেছিল, সে প্রসঙ্গও আলোচনাসাপেক্ষ। প্রখ্যাত পুঁথিগবেষক বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে যে প্রাচীন পুঁথি উদ্ধার করে তার নামকরণ করেছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', সেই পুস্তকে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি এতদঞ্চলে প্রচলিত কৃষ্ণধামালি নামে এক ধরনের প্রচলিত গান থেকে নেওয়া

হয়েছে বলে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পদগুলির ভণিতায় 'বড়ু চণ্ডীদাস' এই নাম উল্লিখিত আছে। ইনিও নানুরের চণ্ডীদাসের মতোই বাশুলি দেবীর উপাসক। প্রাক্-চৈতন্যযুগে রচিত এই পদগুলিকে কীর্তন বলা চলে না। কারণ পদাবলী কীর্তন বা পালাকীর্তনে যে পদ গাওয়া হয়, সেগুলি বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস-জ্ঞানদাস, গোবিন্দ দাস, বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ খ্যাতনামা মহাজনদের দ্বারা রচিত। 'কীর্তন' নামটি বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয়ই যুক্ত করেছেন। তাই অনেকের মতে কৃষ্ণধামালি গানের উন্নততর রূপ হচ্ছে এই কৃষ্ণ ঝুমুর। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর পদগুলিকে ঝুমুর বলতে তাঁদের কোনো আপত্তি নেই। স্বয়ং বসন্তরঞ্জন রায়ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে ঝুমুর বলায় আপত্তি করেননি, কারণ, তাঁর মতে 'ঝুমুর' কোনো নিম্নশ্রেণির গীত নয়। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে সংগীতাধ্যায় অংশে মধ্যযুগের সঙ্গীত সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতশাস্ত্রী রাজ্যেশ্বর মিত্র এই গ্রন্থটিকে ফারসি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছেন। এ সম্পর্কেও বর্তমান লেখকের অন্য একটি প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আবুল ফজলও কোথাও কোথাও ঝুমুর নামে সংগীত পুস্তকের উল্লেখ করেছেন। এ কারণেই 'মানভূমের ঝুমুর' গ্রন্থে ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঝুমুর গানকে দেশি সংগীতের প্রাচীনতম নিদর্শন বলে মেনে নিয়েছেন। কীর্তনের আগেই ঝুমুরের সৃষ্টি হয়েছিল, এমনকি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের পদাবলীও একপ্রকার ঝুমুর বলে তিনি মনে করেন। তবে চর্যাপদগুলিকে ঝুমুর বলা যায় কিনা এ নিয়ে মতভেদ থাকতে পারে। কারণ, চর্যাপদগুলি বিভিন্ন রাগরাগিনী সহযোগে গীত হতো, আর ঝুমুর গান কোনো শাস্ত্রীয় রাগ অবলম্বনে গীত হয় না, এর সুর লৌকিক। আমরা এ পর্যন্ত চতুর্দশ শতকে রচিত গ্রন্থেও 'ঝুমুর' শব্দের উল্লেখ পেয়েছি।

এই প্রাচীন গীতরীতি এখনও শিক্ষিত সম্প্রদায়, লোকগীতির শিল্পী ও শ্রোতাদের কাছে অনাদৃত, অবহেলিত, উপহাস ও কৌতুকের সামগ্রী। কোনো কোনো গবেষক ঝুমুর গানকে সাঁওতালি গানের দ্বারা প্রভাবিত বলে উল্লেখ করে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ড. সুধীরকুমার করণ বলেন যে, সাঁওতালি ভাষায় 'ঝুমুর' শব্দের অস্তিত্বই নেই। ঝুমুর ও সাঁওতালি গান মাদল ধামসা সহযোগে গীত হলেও এর ঠেকা আলাদা এবং মাদলের গঠনও ভিন্ন। সাঁওতালরা লম্বাটে ধরনের মাদল ব্যবহার করেন, ঝুমুর গানের মাদল লম্বা হয় না। সাঁওতালি গান ও নাচ যৌথভাবে পরিবেশিত হয়, ঝুমুর পরিবেশিত হয় এককভাবে। সুতরাং, বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকসংস্কৃতি গবেষক ও অধ্যাপকদের এ-বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আধুনিক কালের ক্যাসেট এবং গ্রামোফোন রেকর্ডে গীতরচয়িতা, সুরকার ও শিল্পীরা ঝুমুর গানকে উপহাসের সামগ্রী করে তুলেছেন। তাঁদের জানা উচিত যে ঝুমুরের সৃষ্টি সেই জয়দেব-এর গীতগোবিন্দম্-এর যুগে, সেই ঝুমুরের ধারা আজও প্রবাহিত।

তবে ঝুমুর গান যে শুধু রাধাকৃষ্ণরই প্রেমকাহিনি নিয়ে রচিত তা নয়। এর বাইরেও বহু ঝুমুর আছে, যা পুরাণ কাহিনি অবলম্বনে রচিত। কিন্তু কিছু গান আছে যা লৌকিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার কিছু কিছু গান আছে যেগুলি চর্যাপদ বা বাউলের মতো সাংকেতিক ভাষায় রচিত। সেই প্রসঙ্গে আসার আগে ঝুমুর গানে রাধাকৃষ্ণবাদের প্রাবল্যের কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেম নিয়ে শৃঙ্গাররসের কাব্য গীতগোবিন্দম্-এর রচয়িতা সংস্কৃতে পদরচনা করলেও তাঁকে আদি বৈষ্ণব কবি বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁর গ্রন্থটিকে বাংলার কৃষ্ণলীলার আদি গ্রন্থ বলে মেনে নেওয়া হয়। প্রাক্‌চৈতন্যযুগের কবি বিদ্যাপতির পদাবলী বা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আদিরসাশ্রিত এবং তা জয়দেবেরই অনুসারী। এই বৈষ্ণব কবিরা দণ্ডী, বাৎস্যায়ন প্রভৃতি রসশাস্ত্রকারদের অনুসরণ করে রাধাকৃষ্ণের শৃঙ্গার বর্ণনা করেছেন। বাৎসায়নের কামসূত্রে শৃঙ্গাররস যেভাবে বর্ণিত হয়েছে তা আজকের নাগরিক সমাজে অশ্লীল বলে মনে হতে পারে। তাই, এদের কাব্যরস ভক্তিরসের অন্তর্ভুক্ত নয়, এবং বেশিরভাগ ঝুমুর গান ভক্তিরসাশ্রিত নয় বলে ঝুমুরের পদ রাধাকৃষ্ণের লীলার আধারে রচিত হয়েছে। চৈতন্য-পরবর্তী যুগে বৈষ্ণব কবিরা শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থ অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন বলে সেগুলির কাব্যরস মূলত ভক্তিরস। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের লীলাকে আশ্রয় করে যে ঝুমুরগান রচিত হয়েছে তা শৃঙ্গাররসাত্মক। এই শৃঙ্গাররসাত্মক বৈষ্ণবপদ যে সীমান্ত বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিল একথা বলাই বাহুল্য। রাধাকৃষ্ণের প্রেম ছাড়াও যে অন্য বিষয়ে ঝুমুর রচিত হয়েছে এবং সেসব ঝুমুরও অনাদিকাল থেকে গীত হয়ে আসছে, সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ঝুমুর গানের ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

শুধুমাত্র শিষ্ট বাংলাভাষাতেই যে ঝুমুর গান রচিত হয়েছে, তা নয়। হিন্দি, মৈথিলী, ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষায় এবং সীমান্ত রাঢ়ের এই অঞ্চলের বিভিন্ন উপভাষাতেও ঝুমুর গান রচিত হয়েছে এবং তা আজও ঝুমুরের আসরে নাচনি ও রসিকেরা পরিবেশন করছেন। ভাষাবিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রীরা জানেন যে বাংলা ভাষার মূলত (১) বঙ্গালী, (২) কামরূপী, (৩) বারেন্দ্রী, (৪) রাঢ়ী, (৫) ঝাড়খণ্ডি—এই পাঁচটি উপভাষায় মানুষ কথা বলেন। যে অঞ্চলে ঝুমুর গানের উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি, সেই অঞ্চলের মানুষ ঝাড়খণ্ডি উপভাষায় কথা বলেন। কিন্তু, ভাষাবিজ্ঞানে যেভাবে উপভাষার বিভাজন করা হয়েছে, তার থেকেও আরো সূক্ষ্ম বিভাজন করা যায়। এছাড়াও এখানকার লোধা, শবর, কুড়মি, ভূমিজ, মাহালি ইত্যাদি সম্প্রদায়ও যে ভাষায় কথা বলেন তা বাংলা ভাষারই অপভ্রংশ, কিছুটা অন্য ভাষা মিশ্রিত। যেসব লৌকিক ঝুমুর প্রচলিত আছে সেগুলি এখানকার লোকসাধারণ তাঁদের মাতৃভাষাতেই রচনা করেছেন। কারণ, লোকশিল্প তো প্রকৃতির মতোই স্বচ্ছ, সহজ, সরল এবং উদার। তাই লোকশিল্পীরা মাতৃভাষাতেই গান রচনা করতে এবং পরিবেশন করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। এছাড়াও সাঁওতালি, মুণ্ডারি ইত্যাদি আদিম ভাষায় এবং মিশ্র ভাষাতেও রচিত ঝুমুরও এই অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কুড়মি, ভূমিজ ও ভুঁইয়াদের ভাষাকে কেউ কেউ কুড়মালি ভাষা বলেন। শুনেছি, সম্প্রতি ঝাড়খণ্ড রাজ্যে 'কুড়মালি'-কে একটি পৃথক ভাষায় মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু আসলে কুড়মালি হচ্ছে বাংলার ঝাড়খণ্ডি উপভাষারই একটি বিভাষা। মানভূমের ঝুমুর গ্রন্থের রচয়িতা ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় একে স্বতন্ত্র ভাষা বলে স্বীকার করেননি। এই মিশ্র বাংলা এ অঞ্চলে শ্রুতিমধুর এবং পরিবেশনের সময় শিল্পীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বলেই এ অঞ্চলের বিখ্যাত বাঙালি ঝুমুর পদকর্তা দীনা তাঁতি এই ভাষায় কয়েকটি ঝুমুর গান রচনা করেছেন। একটি এ ধরনের ঝুমুর গানের উদাহরণ—

ঐসন করিঞে কাছে পরাণ ব্যাকুল, গো—কে জানে মকে।
কে জানে মকে বুকে মারি খাতেই শূল গো—কে জানে মকে।।
এখ্নে দ্যাখ্যা ভার ঘৈসে ডুমুর কা ফুল গো,—ডুমুর কা ফুল।
ফুসলাঞি ফাসলাঞি শ্যাম লিলেক জাতিকুল গো—লিলেক জাতিকুল।
কহৈ দীনা গেল্ জানা, বঁধুয়াকে জুল গো—বঁধুয়াকে জুল।।

দীনা তাঁতি ছাড়াও অন্যান্য পদকর্তারা এই ভাষায় পদ রচনা করার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। পদটিতে শ্যামের নাম উল্লিখিত থাকলেও এই শ্যাম লৌকিক রাধারই গ্রাম্য প্রেমিক। একটি লৌকিক ঝুমুরের উদাহরণ—

সিনাত্যে সিনাত্যে তোহর বেনিয়া উজার
টিকুলী আঁচল গেল ছাতিয়া সাম্হার।

('স্নান করতে করতে তোর চুলের বেনী খুলে গেল। তোর

টিকলী বুকের আঁচল খুলে গেল। এবার তোর বুক সামলে রাখ।' বলা বাহুল্য, সীমান্ত রাঢ়ের বনানী, পর্বত, ঝর্না যেমন উদার, তেমনি ঝর্নার জলে অর্ধনগ্ন হয়ে স্নান করাটাও এখানকার রমণীদের পক্ষে অশ্লীল নয়।)

একটি কুড়মালি ঝুমুরের উদাহরণ—

কাকর হাতে রাদ্দ-রূপা এংটি, কাকর হাতে চাঁপাফুলী
রাজার হাতে রাদ্দ-রূপা এংটি, রাজার হাতে চাঁপাফুলী।

সাঁওতালি ভাষায় রচিত ঝুমুরের উদাহরণ—

সুবা বাবা রুম এঞেনা দেবী দুর্গা সহায় এঞেনা
সানাম্ দিশম্ দিকু বতর্
ক্রেনাও মাঝে বুঝাও কাণা
সুবা বাবা রাজী হই এঞেনা।
... ...
বন্দুকে টাঁই এঞেনা বালটন দা বালা এঞেনা
চামু রাণা ভাগ্যে বাঞ্চা এঞেনা।

এই গানটি সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫) অবলম্বনে সাঁওতাল পরগণা-পশ্চিম বর্ধমানের বিখ্যাত ঝুমুর পদকর্তা চামুরাণা (কর্মকার) রচনা করেছেন।

হিন্দি ভাষায় রচিত ভবপ্রীতানন্দ ওঝার একটি ঝুমুরের উদাহরণ—

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে রাত্রিযাপন করে ভোর রাত্রে শ্রীরাধার কক্ষে এসেছেন। বৃন্দাদূতী শ্রীকৃষ্ণকে বাধা দিয়ে বলছেন—

কৌন হো তুম নেহি কুছ মালুম
ইধার কাঁহাসে আতে হো।
দ্বার সামনা চোর সমান আধ্ মুখড়া দেখলাজ হো
হঠ যাওজী বংশীওয়ালে
কাহেকো অন্দর আতে হো।। রং।।

ভবপ্রীতানন্দ ছিলেন এই বিস্তীর্ণ ঝুমুর অঞ্চলের সর্বাধিক জনপ্রিয় পদকর্তা। সমস্ত ঝুমুরিয়াগণ উপরোক্ত চামু কর্মকার ও ভবপ্রীতানন্দ ওঝাকে গুরু বলে মান্য করেন। ১৪১৯ বঙ্গাব্দের শারদীয় 'নন্দন'-এ এই লেখকের লেখা প্রবন্ধে ভবপ্রীতা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। তিনি ছিলেন দেওঘর বৈদ্যনাথধামের মূল পাণ্ডা বা প্রধান পুরোহিত। সাঁওতালদের মধ্যে সাঁওতালি ভাষার ঝুমুর ছাড়াও বাংলা ভাষায় রচিত ঝুমুর গানের প্রচলন আছে। সাঁওতালদের মাতৃভাষা সাঁওতালি হলেও তাঁরা যে রাজ্যে বাস করেন, সেই রাজ্যের ভাষা তাঁদের দ্বিতীয় ভাষা। পশ্চিমবঙ্গের এবং সীমান্ত ঝাড়খণ্ডের সাঁওতালরা বাংলা জানেন। তাঁদের রচিত একটি ঝুমুরের নমুনা—

উপর কুলি আকাড়া, নেমু কুলি আকাড়া
এতদিন কুথা ছিল গুরুজন, আকাশম্ বেরি জল।

ভূমিজদের ঝুমুরের উদাহরণ—

ই ডুংরি, ই ডুংরি পিয়াল পাক্যেছে
তোহর্ সনে নাই যাব, মন বাঁক্যেছে হে
মন বাঁক্যেছে।

ভুঁইঞাদের ঝুমুর—

ঘরসে বাহির ভেল উলসিত মনোয়া
চলা যেইব ঠাকুর দর্শনোয়া।
রাজাত মাঙ্গে উলসিত মনোয়া
রানীত মাঙ্গে ঠাকুর দর্শনোয়া।

পাঠকদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, যাঁরা লোকসংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন অথবা যাঁরা লোকসংস্কৃতি সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু তাঁরা অন্তত একবার এই সাঁওতাল পরগনা, মানভূম, রাঁচি, সিংভুম, সেরাইকেলা ঘুরে আসুন। দেখে আসুন সেখানকার উচ্চাবচ পর্বতমালা, ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনী, শাল-মহুয়া-অর্জুন-বহেড়া-কেঁদ-পলাশ-কুর্চি-ধ-শিঁয়াকুল-ভেলা গাছের জঙ্গল, আর ছোটো ছোটো জনপদগুলিতে বসবাসকারী এইসব মাহালি-ভূমিজ-ভুঁইয়া-কুড়মি-মাহাতো-লোধা-শবর-খেড়িয়া-বাউরি-বাগদি-সাঁওতাল-মুণ্ডাদের নাচগান, পাশাপাশি সেখানকার তথাকথিত ভদ্র সম্প্রদায়ের এইসব উৎসবে যোগদানের কর্মসূচি। শুধু ঘরে বসে, এই অঞ্চলের মাটি নিয়ে যেমন গল্প লেখা যায় না, সংস্কৃতি চর্চা করা যায় না, তেমনি এখানকার মানুষগুলিকে 'মাওবাদী' তকমা দিয়ে মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাজনৈতিক সততা দেখানো যায় না, যেমন ব্রিটিশ শাসকগণ এদের আখ্যা দিয়েছিল ডি-নোটিফায়েড ট্রাইব, লোধাদের বলতো অপরাধপ্রবণ জাতি।

লৌকিক ভাষায় ঝুমুর রচিত হলেও কাশীপুর-জামতাড়া-ঝরিয়া-ধলভূম ইত্যাদি রাজবাড়িতে যে ঝুমুর পরিবেশিত হতো বা যে-সমস্ত ঝুমুর নাচনি ছাড়াও বৈঠকি ঝুমুর হিসাবে গীত হতো সেগুলি অবশ্যই তৎসম শব্দবহুল বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছে। কেউ কেউ বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের ভাষাকেও অনুসরণ করেছেন। গ্রামোফোন রেকর্ড এবং রেডিওতে গত শতাব্দীর তিরিশ-চল্লিশের দশকে যে ঝুমুর প্রচারিত হয়েছে সেগুলিও তৎসম শব্দবহুল বাংলা ভাষায় রচিত। উদাহরণ—

১. নয়নতারা ঘোরে, শীলদা বাঘের মতন ।। রং ।।
সে যে গোলক রতন, বসু দৈবকী নন্দন,
কংস বধিবার তরে মথুরায় গমন;
সে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যা করে ।। রং ।।
শুনলো সখি শুন, ওকি বলবো বাঘের গুণ
বাঘের দৌরাত্ম্যে পাঁজরে লাগে ঘুণ।
বাঘের ভয়ে হুড়কো দিয়ে থাকি ঘুমের ঘোরে ।। রঙ।।
—চামু কর্মকার

২. কালি নিশি তব সনে, বঞ্চিব সুখ মিলনে
মিলাইব অধরে অধর গো,
হৃদয়ে ধরিব পয়োধর।
আজু ধনি মোরে ক্ষমা কর।। রং ।।
আজ রাধাসনে নিশি, যদি না মিলি রূপসী
ব্যাকুল হবে তার অন্তর গো
মদনে হানিবে ফুলশর গো ।। রং।।
—ভবপ্রীতানন্দ ওঝা

৩. নিশি কোথা ছিলে শ্যাম
পুরালে কার মনস্কাম—বঁধূ হে—
প্রভাতে আইলে কীবা কাজে, নিলজ হে, নিলজ হে—
ফিরে যাও হে মানে মানে।
—নরোত্তম

৪. কোকিলা করত গান আকুল হইল প্রাণ গো—
দিবানিশি কেঁদে মরি আমি তোমারি জ্বালায়—
আশা ভাঙিলে গো, (ও) প্রেম সহা নাহি যায়
—দ্বিজ হরিপদ

৫. ... ...
নিঝুমের রাতি গত হলো দূতী
আর আছে কিবা আশা গো—
ঐ দেখ প্রদীপের পারা নভে শুকতারা
দিতেছে মোরে নিরাশা গো।।
ঘুঘু পিকরবে নাশিল গরবে
ফুরাইল শ্যামের আশা গো—
ওই শুন জেগেছে বিহঙ্গ প্রভাতী প্রসঙ্গ
প্রকাশিতে নিজ ভাষা গো—
—বিষ্ণুপদ দাস

৬. হে কৃষ্ণমুরারি হে বৃন্দাবনচারী ।। রং ।।
সুন্দর গোপাল সে যে যশোদাদুলাল
চরণেতে রুনুঝুনু নূপুরেরই তাল।
বাঁশির সুর বয় উজানে যমুনারই বারি ।। রং ।।
অর্জুনেরই সখা শিরেতে শিখী পাখা
ত্রিভঙ্গ বঙ্কিমঠামে অঙ্গখানি বাঁকা

কৌরব পাণ্ডব রণে সুদর্শনধারী ।। রং ।।

—নিত্যানন্দ দাস

(গানটি রেবা সোম 'হিজ মাস্টার্স ভয়েস'-এ রেকর্ড করেছেন।)

এছাড়াও ঝুমুর অঞ্চলের সহস্রাধিক খ্যাত অখ্যাত ঝুমুর পদকর্তার গান বিভিন্নভাবে প্রচলিত আছে।

এতক্ষণ আমরা যে আলোচনা করলাম তাতে দেখা গেল যে রাধাকৃষ্ণের প্রেম অবলম্বনেই ঝুমুর পদকর্তাগণ অধিকাংশ ঝুমুর রচনা করেছেন। এছাড়াও পাশাপাশি লৌকিক জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-প্রেম-বিরহ এমনকি বঙ্গ-বিহার সংযুক্তির বিরুদ্ধে, পুরুলিয়াকে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে, রেশনে কাপড়-চিনি-কেরোসিন-চালের অপ্রতুলতার দুঃখ বর্ণনা করতে, আসামের চা-কুলির যন্ত্রণা ব্যক্ত করতে পীতাম্বর, জগৎ, বরজুদাস, উদয়, মুক্তেশ্বর, গদাধর প্রমুখ একাধিক ঝুমুর পদকর্তা ঝুমুর গান রচনা করেছেন।

শুধু রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনি নয়, রামায়ণ-মহাভারতের বহু ঘটনাও ঝুমুর গানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঝুমুরিয়াগণ পালা আকারে সেইসব ঝুমুর গ্রথিত করে আসরে পরিবেশন করতেন। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালায় ভবপ্রীতা-র একটি পদ এখানে উল্লেখ করছি—

শক্তিশেলে যেদিন পড়িল লক্ষ্মণ
কাঁদেন শ্রীরাম রাজীব লোচন
ভাসেন নয়ন নীরে।
উঠ উঠ ধীর, ধর ধনুতীর, দশশির বধিবারে।।
হায়রে লক্ষ্মণ, কেন এ শয়ন মধ্যরণ পারাবারে ।। রং ।।
রিপুরক্তে কুলের কালিমা ধোয়াবি
উদারিবি কি সীতারে রে ।। রং ।।
ঘরে ফিরে গেলে জিজ্ঞাসিবেন মাতা
রাম ফিরে এলি, লক্ষ্মণ গেল কোথা
হায়রে অবোধ কি দিয়ে প্রবোধ
আমি প্রবোধিব বিমাতারে ।। রং ।।

'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী' গ্রন্থে অবশ্য এ গানটির অন্য পাঠ আছে। সেই পাঠটিকে প্রামাণ্য বলে ধরে নিতে হবে। বর্তমান পাঠটি এ-যুগের একজন ঝুমুর শিল্পীর কাছ থেকে সংগৃহীত। আসলে, লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যই এই যে শিল্পীগণ পরিবেশনের সময় নিজের মনোমতো কথা যোগ করে নেন।

পালা ঝুমুর গাইবার সময় প্রতিটি পদের আগে পয়ার গাওয়া হতো। ত্রিপদী ছন্দে রচিত হলেও একে পয়ার বলা হতো। তারপর মূল গান গাওয়া হতো। স্থায়ী অংশটিকে ধুয়া বলা হতো। ঝুমুর গানের 'চপ্‌তা'য় (পাণ্ডুলিপিকে 'চপতা' বলে) লাইনটির শেষে ধ্রু, অথবা রং লেখা হতো। রামচরণ দাস রচিত 'কীচক বধ' পালার একটি গান এখানে উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা হলো—

।। পয়ার ।।
সভাজনগণ কয় শুন রাজা মহাশয়—
সমূলেতে হইবে নিপাত।
সৈরিন্ধ্রী রমণী যেই লক্ষ্মী স্বরূপিণী সেই
তারে যেই কৈল পদাঘাত।।

(মহাভারত পাঠক মাত্রই জানেন যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে তাঁরা ছদ্মবেশে বিরাট রাজার গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। যুধিষ্ঠির হয়েছিলেন কঙ্ক, ভীম হলেন বল্লব, তিনি পাকশালায় থাকতেন। অর্জুন বৃহন্নলা নাম নিয়ে নৃত্যগীত শেখাতেন, নকুল-সহদেব গ্রন্থিক ও তন্ত্রীপাল নাম নিয়ে পশুশালা দেখতেন এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম নিয়ে পঞ্চগন্ধর্বের স্ত্রী পরিচয় দিয়ে রানীর পরিচারিকার কাজ করতেন। বিরাটরাজের শ্যালক কীচক দ্রৌপদীকে কুপ্রস্তাব দেয় এবং তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। সৈরিন্ধ্রী দ্রৌপদী বিরাটরাজের কাছে অভিযোগ জানাতে এসেছেন)

।। রং ।।
কঙ্ক বলেন বাণী শুনগো সৈরিন্ধ্রী রানি,
অন্তঃপুরে ফিরে যাই ললনা।
আর কেঁদনা, কেঁদনা।। ধুয়া ।।
তব যত জ্বালাতন দেখিল গন্ধর্বগণ
(এখন) সময় বুঝে তারা করিল মার্জনা ।। ধুয়া ।।
কর্মফল ভোগাভোগ, বিধি করেন সংযোগ,
যেমন কর্ম তেমন ফল আছে জানা ।। ধুয়া ।।
সমূলেতে বিনশ্যতি হইবে যে দুষ্টমতি
রামচরণের ঘুচিবে যন্ত্রণা ।। ধুয়া ।।

ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'মানভূমের ঝুমুর' গ্রন্থে পুরুলিয়ার বেগন-কোদর গ্রামের প্রসিদ্ধ ঝুমুরপদকর্তা কানাই সিং-এর দপ্তর থেকে পাঁচটি ঝুমুরের 'চপ্‌তা' উদ্ধার করেছেন। এগুলি পুরনো বালি কাগজের পাতায় হাতের লেখা বাঁধানো পুথি। এই চপ্‌তাগুলিতে নৌকাখণ্ড, শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা, সুভদ্রাহরণ, সমুদ্রমন্থন, অভিসার মিলন, বনপর্ব, লক্ষ্যবিদ্ধা, গদাপর্ব, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, দুর্জয় মান ইত্যাদি যে পালাগুলি গ্রন্থিত আছে, সেগুলি কানাই সিং রচিত। এছাড়াও কানাই সিং চপ্‌তাতে রামা, নরু, দীনাতাঁতি, দ্বারিকা, মনোমোহন, যদুরায়, গৌরাঙ্গিয়া প্রমুখ পদকর্তাদের রচিত বিভিন্ন ঝুমুর পদ ও ঝুমুর পালা সংগ্রহ করেছেন। পঞ্চম 'চপ্‌তা'য় গেণ্ডুলাপড়া (মদনমোহন), মুরলীপাড়া (দুলুয়া), বৃন্দাবনপাড়া (রামা), কলঙ্কভঞ্জন (গৌরাঙ্গিয়া) অর্জুনপাড়া (যদুরায়) ইত্যাদি পালাগুলি গ্রন্থিত আছে। 'পাড়া' শব্দের অর্থ হল 'পালা'। পর্যায় থেকে পারা > পাড়া > পালা হয়েছে। সীমান্ত রাঢ় অঞ্চলে শব্দের মূর্ধন্যীভবনও যেমন হয়, দন্ত্যীভবনও হয়। তালের রস যেমন তালি থেকে তাড়ি হয়েছে। 'অর্জুনপাড়া' পালায় অর্জুনের সাথে হনুমানের যুদ্ধ বর্ণিত হয়েছে। এরূপ এই পালাগুলিতে ভাগবতপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতের বহু অজ্ঞাত তথ্য পাওয়া যায়।

ভবপ্রীতানন্দ ওঝার 'বৃহৎ ঝুমুর রসমঞ্জরী' নামক মুদ্রিত গ্রন্থে যে পালাগুলি পাওয়া গেছে, সেগুলি হলো—বৈদ্যনাথ মাহাত্ম্য, শ্রীকুণ্ডেশ্বরী মহাত্ম্য, অভিমন্যু-বধ, রাসবর্ণন, জলসম্বাদ, বাসরসজ্জা দুর্জয় মানভঞ্জন, কলঙ্কভঞ্জন, কুন্তীগান্ধারী কলহ, ধনঞ্জয় পালা। এ তথ্য অন্যত্র বর্তমান লেখক উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও বিশের শতকে নিত্যানন্দ দাস অল ইন্ডিয়া রেডিও থেকে 'বালীবধ', 'কলঙ্কভঞ্জন', 'সীতাহরণ', 'কৃষ্ণকালী' ইত্যাদি পালাগুলি প্রচার করেছিলেন গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের শেষাশেষি। একথাও অন্য প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র রাধাকৃষ্ণবাদই যে ঝুমুরের প্রধান উপজীব্য তা নয়, অন্যান্য বিষয়েও বহু পদ বা পালা রচিত হয়েছে। তবে আশিভাগ ঝুমুর রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে। কেননা, 'কানু ছাড়া গীত নাই'। এ যুগেও ফিল্মে গাওয়া হচ্ছে 'সাম ঢলে যমুনা কিনারে/ আ যা রাধে আ যা তুঝে শ্যাম পুকারে।' আধুনিক বাংলা গানেও শিল্পীরা গাইছেন, 'ওপারে তুমি শ্যাম এপারে আমি, মাঝে নদী বহে রে!' আবার রাধা-কৃষ্ণ হয়ে গেছেন লৌকিক প্রেমিক-প্রেমিকা, বনে বনে পাতা সংগ্রহ করে, পিয়াল সংগ্রহ করে, কাঠ কুড়ায়, ঘুঁটে কুড়ায় যে মেয়েরা তারা হয়ে যায় রাধা, আর মোষ চরায় বা ছাগল চরায়, অথবা কেঁদকানালীর মাঠে হাল বায় সেইসব রাখাল বাগাল মান্দেররা হয়ে যায় শ্রীকৃষ্ণ। এই সমস্ত লৌকিক ঝুমুর গানগুলিকে খাঁটি লোকসঙ্গীত আখ্যা না দিলে তার অমর্যাদা করা হয়। স্থানভেদে, ঋতুভেদে, সুর ও তালের বৈচিত্র্যভেদে তার বিভিন্ন প্রকারভেদ—দাঁড়ঝুমুর বা দাঁড়শালিয়া ঝুমুর, পাতা ঝুমুর, ভাদরিয়া ঝুমুর, উত্তরী ঝুমুর, শিখরী ঝুমুর ইত্যাদি। এ সম্পর্কেও বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

চর্যাপদগুলি সান্ধ্য ভাষায় রচিত। এর অর্থ কতক বোঝা যায়, কতক বোঝা যায় না—আলোআঁধারি ভাষা। তাই বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ এর অর্থ খোলসা করে বলেন না। বলেন, 'গুরু পুচ্ছিঅ জান', অর্থাৎ গুরুকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নাও। কোনো কোনো পদকর্তা এ ধরনের ঝুমুরও রচনা করেছেন। চর্যাগান বা বাউলগানের মতো এই গানগুলির অর্থও দুর্বোধ্য। এগুলির অর্থ বুঝতে হলে গুরুর কাছে যেতে হবে। এগুলিকে 'নির্গুণ ঝুমুর'ও বলা হয়। এইরকম কয়েকটি ঝুমুরের উদাহরণ দেওয়া হলো—

১. এমন কারিগর, কে গড়েছে এমন ঘর,
তিনপুর কায়ের ভিতর—রে কালিয়া—
ঘর করিলি এত বড়, তাতে দিলি পচা খড়—
মুঠনাতে চিপা নাহি জর—হে কালিয়া —ইত্যাদি
—দীনা তাঁতি

২. সকল জীব জনমিল জলে,
সে জল ছিল কোন পাতালে?
সে জল কে আনিল হেথা
(বল) জলের কেবা মাতাপিতা? ইত্যাদি
—বরজুরাম দাস

৩. মা বিটি সতীনগণ, তাহার স্বামী একজন
বুঝ দেখি মন ।। রং ।।
বিটির গর্ভে মায়ের জনম। ই ত বড় অকারণ ।। রং ।।
... ...
বিনা গর্ভে হয় জন্ম; ছেল্যার নামটি পারশধন
বুঝ দেখি মন।। ইত্যাদি
—গোবর্ধন

৪. পিতা-সুতা-যান-রথ ধ্বজে যার,
সেই সদা প্রাণ দহে গো আমারে,
নিকটে না হেরি তারে। ইত্যাদি
—ভবপ্রীতা।

চামু কর্মকার জামতাড়ার রাজবাড়িতে নাচনি নিয়ে ঝুমুর গাইলে ভবপ্রীতানন্দ তার নিন্দা করেন। চামু তৎক্ষণাৎ গান বাঁধলেন—

শুনহে পুরাণের রঙ্গ, লিঙ্গ হলেন ভগাঙ্গ
শুনেই লোকে করে আলিঙ্গন—
নরে কি পাইবে অন্ত, অনন্ত না পায় অন্ত
মহামন্ত্ররূপী মহাজন হে—
যোনিনিন্দা না কোরো কখন ।। রং ।।
লিঙ্গ হইলেন ত্রিলোচন, জানে যত যোগীজন
যোনিলিঙ্গে চামুর জনম,
হে মহাজন ।। রং ।।

নিরক্ষর চামুরাণার ভাষাজ্ঞান তথা পুরাণসম্পর্কিত গান এখানে লক্ষ করার বিষয়। এখানে 'যোনি' অর্থে স্ত্রীজাতিকে বোঝানো হয়েছে। চামু অখ্যাত, সমাজবিবর্জিত নাচনিদের জননী বলে সম্মান জানালেন।

বাংলাভাষায় ও বাংলার সমগোত্রীয় অন্যান্য ভাষায় রচিত ঝুমুরের পরিধি সমুদ্রের মতোই বিশাল ও অনন্ত। দীর্ঘ গবেষণা ও ক্ষেত্রসমীক্ষা করেও এর কূল কিনারা পাওয়া যায় না। কেউই এ সম্পর্কে আলোচনা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। বর্তমান লেখকের পক্ষেও সম্ভব নয়। তবে, বিভিন্ন গবেষকগণের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রবন্ধ বা গ্রন্থসমূহ পাঠ করলে আগামী দিনের গবেষকদের আরো গভীরে প্রবেশ করার পক্ষে সহায়ক হবে। যাঁরা ঝুমুর নিয়ে কাজ করছেন, তাঁরা ঝুমুর অঞ্চলের ঝুমুরপ্রেমিক মানুষদের কাছে ধন্যবাদার্হ হবেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

বিগত শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকে এবং পরবর্তীকালে ষাট-সত্তরের দশকে কয়েকজন উৎসাহী শিল্পী গ্রামোফোন রেকর্ড এবং রেডিও মারফৎ ঝুমুর গানকে প্রচারের মাধ্যমে বৃহত্তর বঙ্গে পরিচিত করানোর চেষ্টা করেছিলেন। তাঁদের অকালপ্রয়াণে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে উপযুক্ত উৎসাহদাতা বা পৃষ্ঠপোষকের অভাবে খাঁটি ঝুমুর গান ও ঝুমুর শিল্পীরা অবজ্ঞাত থেকে গেছেন। উপরন্তু কিছু কিছু মেকি ঝুমুরশিল্পী ও মেকি ঝুমুর রচয়িতা সিডি বা ক্যাসেট বিক্রিবাটা করে অর্থ উপাজন করে নিলেন। তুলনায় বাংলা লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারাগুলি, যেমন ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, সারি, জারি, চটকা, ধামাইল, বাউল ইত্যাদি গান বিকৃতির শিকার না হয়েও সসম্মানে ও সগৌরবে উভয় বাংলায় সেই ডিস্ক রেকর্ড প্রকাশের প্রথম যুগ থেকে আজো প্রচারিত হচ্ছে, এইসব গানের শিল্পীরাও প্রথম শ্রেণির শিল্পী হিসাবে সম্মানিত ও জনপ্রিয়।

তাই খাঁটি ঝুমুরের আরো ক্ষেত্রসমীক্ষার অবকাশ আছে। নাচনি প্রথা বিলুপ্ত হতে চলেছে সামাজিক কারণেই, তবুও দু-একজন নাচনি এখনো জীবিত আছেন এবং কিছু কিছু শিল্পীর রেকর্ড করা এবং স্বরলিপি প্রণয়ন করে তা সযত্নে রক্ষা করার দিকে নজর দেওয়ার সময় এখনো আছে। এভাবেই ঝুমুর গানকে মেকি সঙ্গীত ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে।

তথ্যঋণ

১. *সীমান্ত বাংলার লোকযান*, ড. সুধীরকুমার করণ
২. *মানভূমের ঝুমুর*, ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭১)

সূত্র : প্রবন্ধ—নন্দদুলাল আচার্য, অশোক দাস, নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, যুধিষ্ঠির মাজি, শান্তি সিংহ। 'যোনিনিন্দা না করো কখন' গানটি চামুর পৌত্র আশীর্বাদ কর্মকারের কাছ থেকে সংগৃহীত।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

পড়াশকোল কোলিয়ারি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেড

কর্মচারী ও সদস্যবৃন্দ

Sl. No. 32

With best compliments of

UNITED SAW MILLS

TIMBER MERCHANT & GENERAL ORDER SUPPLIER

G. T. Road, Main Gate, Durgapur-713203
Phone : 0343-2582381, Mobile : 9434026553, 9434647691

Sl. No. 123

মরাঠি কৃষ্টি সংস্কৃতি লোকাচার

মধুছন্দা মিত্র ঘোষ

আরব সাগরের লোনা জলহাওয়ার নাগালে, পশ্চিমঘাট ও সহ্যাদ্রী পাহাড়কোলে মহারাষ্ট্র রাজ্যের লৌকিক জীবনগাথায় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, ধর্ম, লোকাচার, শিল্প, সাহিত্য, সংগীতের সুন্দর এক বনেদিয়ানা দেখতে পাওয়া যায়।

প্রথমেই বলতে হয় ঐতিহাসিক মরাঠা সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছত্রপতি শিবাজী রাজে ভোঁসলে—যিনি সমগ্র মহারাষ্ট্রে দেবতা জ্ঞানে পূজিত হন। মরাঠা সাম্রাজ্যের স্থপতি হিসাবে তিনি 'হিন্দাভি স্বরাজা' অর্থাৎ 'স্বাধীন হিন্দু রাজ্যের' মর্যাদা দেন মরাঠা রাজ্যকে। মহারাষ্ট্রের জনমানস শিবাজী মহারাজকে বন্দনা করেন—

হর হর মহাদেব
জয় ভবানী, জয়তু শিবাজী।

মুম্বইকর তথা সমগ্র মরাঠা রাজ্যবাসীর বড়ো প্রাণের দেবতা, বড়ো প্রিয় দেবতা 'গণপতি বাপ্পা'। প্রবল আনন্দ উৎসাহ উদ্দীপনা সমারোহে পালিত হয় 'গণেশ চতুর্থী' বা 'বিনায়ক চতুর্থী'। এই গণপতি উৎসব দেখার মতো, টুকে রাখার মতোই উৎসব। দশদিন ব্যাপী শ্রীগণেশ পুজোৎসবে মেতে থাকেন তামাম মহারাষ্ট্র রাজ্যবাসী।

ভাদ্র মাসের 'শুক্লা চতুর্থী'তে শুরু হয় 'বিনায়ক চতুর্থী' বা 'বিনায়ক চৌথি' বা 'গণপতি উৎসব'। দশদিনের এই গণপতি উৎসব শেষ হয় 'শুক্লা চতুর্দশী'তে। সেই সময়টিকে মরাঠায় বলা হয় 'অনন্ত চতুর্দশী'। শ্রীগণপতি বাপ্পার আরাধনায় মরাঠাবাসী মুখর হন—

জয় গণেশ জয় গণেশ জয় গণেশ দেবা।
মাতা জাকি পার্বতী পিতা মহাদেবা।।
একদন্ত দয়াবন্ত চার ভূজাধারী।
মাথে সিঁন্দুর মোহে মুসে কী সবারি।।

মহিলারা গণেশ চতুর্থীর জন্য কেনেন সবুজ রঙা বিশেষ শাড়িটি। তাঁরা হাত ভর্তি পরেন সবুজ রঙের কাচের চুড়ি। প্রসঙ্গত মরাঠি হিন্দু বিবাহিতা মহিলাদের শুভ মঙ্গল চিহ্ন হল 'সবুজ'। তাই গণেশ পূজার তৃতীয় বিশেষ দিনটিতে তাঁরা সবুজ আবরণ ও আভরণে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন।

এখানে আরও একটা কথা বলে নেওয়া যায়, মরাঠি অবিবাহিতা তরুণীরা কিন্তু সবুজ রঙের পোশাক এড়িয়ে চলেন। তবে দিনকাল বদলেছে। এই প্রজন্মের মেয়েরা এতো নিয়মনীতি প্রথার তোয়াক্কা করে না। এই প্রজন্মের আধুনিকা মরাঠি অবিবাহিতা মেয়েদের ওয়ার্ড্রবে থাকতেই পারে সবুজরঙা ট্রেন্ডি ওয়েস্টার্ন পোশাক-আশাক।

এই পুজোর সময় বিবাহিতা মহিলারা নাকে নথ পরেন। এটিও মরাঠি মহিলাদের সধবা চিহ্ন। অবস্থাভেদে সোনা বা হীরের নাকছাবি না হলেও ঝুঠো গহনার নাকছাবিটি তাঁরা নাকে ধারণ করবেনেই এই উৎসবে। গণপতি বন্দনায় তাঁরা উদাত্ত হয়ে প্রার্থনা করেন—

বক্রতুণ্ড মহাকায় সূর্যকোটি সমপ্রভা।
নির্বিঘ্নং কুরু মে দেব সর্বকার্যেষু সম্ভবা।।

গণেশ পুজোর চতুর্থী বা পঞ্চম দিনে প্রতিটি পরিবারের মরাঠি মহিলারা 'মঙ্গলা গৌরী' ব্রত করেন। হিন্দু মতে 'মঙ্গল' মানে 'পবিত্র' 'গৌরী' হলেন গণেশমাতা পার্বতী। তবে কোথাও গৌরীকে শ্রীগণেশের ভগ্নি অর্থাৎ ধনভাণ্ডারের দেবতা লক্ষ্মী রূপেও বর্ণনা করা হয়। এইসব শাস্ত্রমতে 'মঙ্গল গৌরী' পূজায় একই সাথে গণেশ ও লক্ষ্মী প্রতিমা পূজিত হন। গৃহী পুজোগুলোয় গণেশ মূর্তি যেদিন গৃহস্থ ঘরে বরণ করে আনা হয়, একই সাথে 'গৌরী' দেবীকেও আনা হয়। আবার অনেকে গৌরী পূজার একদিন আগেই মূর্তি ঘরে বরণ করে আনেন। গৌরী মূর্তি গৃহস্থ বাড়িতে নিয়ে আসেন বাড়ির গৃহিনী। পেতল বা তামার থালা বা ঘটের ওপর গৌরীকে বসিয়ে মহিলারা পদব্রজে শোভাযাত্রা সহকারে গৃহে আসেন। এখানে পরিবারের পুরুষদের ভূমিকা একেবারেই নেই।

'গৌরী'কে সবুজ শাড়ি, সবুজ চুড়ি, নাকে নথ্, গলায় হার ও মাথার পেছনে চুলে ফুলের 'ভেনি' লাগানো হয়। মরাঠি মহিলারা নিজেরাও অনুরূপ সাজে নিজেদের সাজিয়ে তোলেন। এবং মহিলারা নিজেদের মধ্যে হলুদ, কুমকুম, সিঁদুর, নারকেল, ফুলের মালা, ছোটো কাপড়ের টুকরো, কলা, চাল—এমনকি কেউ কেউ নতুন শাড়িও পরস্পরকে আদানপ্রদান করেন। এটিই মরাঠি সমাজে প্রথা।

পরিবারের মহিলারা গণেশ চতুর্থীর দ্বিতীয় দিনে 'হরতালিকা ব্রত' পালন করেন। মহিলারা হরতালিকা ব্রত উপলক্ষে দু-ধরনের ব্রত রাখেন। কেউ কেউ সম্পূর্ণ 'নির্জলা উপবাস' করেন আবার অনেকে 'ফলাহার উপবাস' করেন। এই ব্রত শেষে মহিলারা তিলের লাড্ডু, গজক, রিওয়ারি ইত্যাদি মিষ্টান্ন গ্রহণ করেন। ব্রত উদ্‌যাপন কালে গণেশ স্তোত্র, ভজন গান ইত্যাদি অবশ্যই পালন করতে হয়। মনে করা হয়, যিনি এই ব্রত পালন করছেন তিনি ও তাঁর পরিবারবর্গ সুস্বাস্থ্য, প্রতিপত্তি ও সুখশান্তি লাভ করেন।

মরাঠি মহিলারা গণেশ পূজার তৃতীয় দিনে বাড়িতে জোয়ারের আটা দিয়ে 'ভাক্‌রি রোটি' নাম এক ধরনের রুটি প্রস্তুত করেন এবং পালং শাক কিংবা মেথি শাক দিয়ে 'হরা সব্‌জি' রাঁধেন। শ্রীগণেশ-গৌরীকে এই প্রসাদ 'ভোগ' হিসাবে নিবেদন করা হয়। পরে এই ভোগ পরিবারের সবাই ভক্তি সহকারে গ্রহণ করেন। পুজোর কটা দিন মরাঠি পাক্‌শালায় শুধুই নিরামিশ ব্যঞ্জন। পূজা চলাকালীন মরাঠি মহিলারা প্রথামতো বাড়িতে পুরণ পোলি, মোদক, সাবুদানা খিচুড়ি, রাজগিরা পুরি, পালক পনির, আলু মেথি, ভাক্‌রি রোটি, গাজর কা হালোয়া, তিল কি লাড্ডু, নারিয়েল বেসন কি লাড্ডু, পায়েস ইত্যাদি ব্যঞ্জন

প্রস্তুত করেন।

মরাঠি মহিলাদের মধ্যে এই সময় কিছু আকর্ষণীয় খেলা তথা মজাদার খেলা প্রচলিত। 'মঙ্গলা গৌরী' পুজোর দিন মহিলারা সারা রাত 'ঝিম্মা' আর 'ফুগারি' নামে হাস্যব্যঞ্জক খেলা খেলেন। 'ঝিম্মা'তে মরাঠি মহিলারা হাতে তালি দিয়ে গানের ছন্দে এর ওর পেছনে লাগেন। 'ফুগারি'তে মহিলারা পরস্পরের হাত ক্রশ করে ধরে গোল হয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে থাকেন। রাতভর এই 'ঝিম্মা' এবং 'ফুগরি' করে কাটিয়ে দেন। পরের দিনই 'হলদি কুমকুম' সহযোগে গণেশ-মঙ্গলা গৌরী নিরঞ্জনে বাড়ির পুরুষ সদস্যদের সাথে মহিলারাও সামিল হন।

চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি মরাঠিদের নববর্ষ। এই দিনটিতে বিশেষ একটি উৎসব পালিত হয় প্রতিটি মরাঠি পরিবারে। মরাঠি নববর্ষের উৎসবটির নাম 'গুড়ি পড়ওয়া'। নববর্ষের দিন, একটি বাঁশের লাঠির ডগায় নতুন কাপড় বেঁধে তার উপর একটি তামা বা রুপোর ঘট উপুড় করে রাখা হয়। এই ঘটে জড়ানো হয় ফুলের মালা, নিমপাতা, আম্র পল্লব ও মিষ্টান্ন। 'গুড়ি' বলা হয় একেই। আর 'পরওয়া' মানে হল পরব বা উৎসব। এই সজ্জিত গুড়িকে মূল দরজার প্রবেশ পথে অথবা বাড়ির জানলায় স্থাপন করা হয়।

কথিত আছে, রাবণ বধ ও চোদ্দ বছর বনবাস শেষে শ্রীরামচন্দ্র এই দিন অযোধ্যায় ফেরেন। আবার ঐতিহাসিক মতে শিবাজী মহারাজার বিজয়পতাকার প্রতীক হল এই গুড়ি। পৌরাণিক আখ্যান শোনায় এই গল্প। মহাপ্রলয় শেষে এই দিনই ব্রহ্মা আবার জগৎ সৃষ্টির কাজে মেতে উঠেছিলেন। তাই একে ব্রহ্মধ্বজও বলা হয়। আবার প্রকৃতিগত দিক থেকে এই উৎসবের তাৎপর্য হল এই সময় রবিশস্য ঘরে তোলা শুরু হয়।

এমনই নানা উৎসব ছাড়াও মহারাষ্ট্রের নিজস্ব কিছু ঐতিহ্যবাহী লোকসংস্কৃতিও রয়েছে। এই সমস্ত লোকগান গ্রামমরাঠায় যথেষ্ট জনপ্রিয়। যেমন 'লাবনি' ও 'পোভারা' দুটি জনপ্রিয় লোকসংগীত। হারমোনিয়াম, 'ঢোলকি', 'টুনটুনি' (একাতারা), খঞ্জনী, 'হালগি' (ছোটো খঞ্জনী), 'কাড়া', 'লেজিম' ইত্যাদি অতি বিকট শব্দের বাদ্য যন্ত্র সহকারে লাবনি লোকগান পরিবেশন করা হয়।

'ওয়ি' হল একান্ত মরাঠি লোকগান, গ্রাম-মরাঠার মহিলারা সান্ধ্য-সংগীত হিসাবে এই গান গেয়ে থাকেন। এই গানের মাধ্যমে বিবাহিতা মহিলারা তাদের বাপের বাড়ি ও স্বামীর বাড়ির বিবরণাদি পেশ করে থাকেন।

'সুভাষিণী' নামে এক ধরনের বিবাহ গান মরাঠি বিবাহ উৎসবে প্রচলিত। বিবাহ উৎসবে 'হলদি' ও 'গহনা' নামক বিশেষ প্রথা চলাকালীন মহিলারা সমবেত কণ্ঠে এই সুভাষিণী গেয়ে থাকেন।

'পালানে' নামক এক সনাতন গান গেরস্থ মহিলাদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। এটি আসলে শিশুদের ঘুমপাড়ানি গান। দুগ্ধপোষ্য শিশুটিকে কোলে-পিঠে নিয়ে চাপড়িয়ে ঘুমপাড়ানোর সময় 'পালানে' গুনগুন করে গাওয়া হয়।

'ভাল্‌রি' লোকগানটি একান্তই কৃষিকাজে নিযুক্ত চাষিদের শস্য রোপণ ও ফসল তোলার সময় সমবেত স্বরে গাওয়ার রীতি। এই ভাল্‌রি বা চাষিগান পুরুষরাই গেয়ে থাকেন।

'লাবনি' গীত ও নৃত্য শুধুমাত্র মরাঠি মহিলারাই মঞ্চে করে থাকেন। মহারাষ্ট্রের 'লোকসংগীত ও লোকনৃত্যের সেরা রত্ন' হল এই লাবনী। মরাঠি মহিলারা নয় গজ শাড়ি মরাঠি শৈলীতে পরিধান করে সমবেত বাদ্যযন্ত্রের মূর্ছনায় নৃত্যগীতের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। আঠারোশা-উনিশ শতকে রাজ্যে মরাঠা বীর সেনানীদের ক্লান্তি দূর করতে ও উজ্জীবিত করতে প্রমোদমূলক এই লাবনি নৃত্যগীতের প্রচলন হয়। সমাজ প্রেম লোকাচার নিয়ে সমৃদ্ধ লাবনি।

মরাঠি নিজস্ব সংগীতে ধ্রুপদ, গোনধল্, ললিতা, তুম্বরি, অভঙ্গ গম্, কীর্ত্তন, ভজন ইত্যাদিও ব্যবহার হয়।

মহারাষ্ট্রের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে উপকূল অঞ্চল। এই উপকূল অঞ্চলের মৎসজীবীদের বলা হয় 'কোলি' সম্প্রদায়। যেহেতু কোলি সম্প্রদায় সাগর ও জেলেজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেহেতু মৎস্যজীবীদের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে কোলি নাচ। মহিলা ও পুরুষরা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে কখনও বা জোড়ায় কোলি নৃত্য পরিবেশন করেন। মহিলারা সাধারণত সবুজ রঙের শাড়ি ও পুরুষরা তিনকোণা বিশিষ্ট খাটো লুঙ্গি পরিধান করেন। পুরুষদের হাতে ধরা থাকে দাঁড় ও মহিলাদের ঝুড়ি। কোলি নাচে—ক) নৌকা বাওয়া, খ) সাগরের ঢেউ ভাঙা, গ) জাল দিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি ভঙ্গিমাগুলি নাচের মাধ্যমে সুচারুভাবে দেখানো হয়।

'ডিন্ডি' নামক এক ধরনের ধর্মীয় নৃত্য মূলত কৃষ্ণলীলা। মরাঠি গদ্য কবিতার সংমিশ্রণ ডিন্ডির মূলধন। কার্তিক মাসের একাদশী তিথিতে এই ডিন্ডি নাচ পরিবেশিত হয়। 'ডিন্ডি' হল ছোট্ট ড্রামের মতো দেখতে এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। সেটির সাথে মৃদঙ্গম, বাঁশি ইত্যাদি সহযোগে এই নাচ ও গান পরিবেশন করা হয়। মরাঠার 'ভারকরি' জনগোষ্ঠীর কাছে এই ডিন্ডি নাচ খুব জনপ্রিয়। 'কালা' নৃত্যও কৃষ্ণলীলার মতোই এবং ডিন্ডির সাথে সামান্য পার্থক্য আছে।

'গানগড়ি গজা' নৃত্যটি মহারাষ্ট্রের কোলাহপুর জেলার ধানগড় গঞ্জের লোকনাচ। গোচারণভূমিকে শ্যামলা প্রকৃতির আদর্শ পশুপালন ও গবাদি পশুদের উপযুক্ত চারণভূমি জ্ঞান করে কাব্যধর্মী এক ধরনের 'অভি' লিখিত গান নাচ করা হয়। পরমা প্রকৃতির বর্ণনা থাকে 'অভি' কাব্যে।

ঐতিহ্যবাহী মরাঠা লোকনাচে 'তামাশা' একটি যাত্রা অঙ্গের শৈলী। পার্শী সম্প্রদায় থেকে হাস্যরস নৃত্যনাট্য এসেছে যা আসলে সংস্কৃত। 'প্রহশন'-এর প্রভাবযুক্ত। রামায়ণ মহাভারতের চরিত্র বা পৌরাণিক কথামালা থেকে আবৃত্তি সহকারে পেশ করা হয় তামাশা। ভারতীয় মার্গ সংগীতের নানান রাগ, বিশেষত ইমন, পিলু, ভৈরবী প্রভৃতি তামাশায় ব্যবহৃত হয়। প্রখ্যাত প্রাচীন সাহিত্যিক রাম যোশীকে (১৭৬২-১৮১২) 'তামাশা' যাত্রার জনক বলা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে আর এক মারঠি সাহিত্যিক মোরপন্থ তামাশাকে পরিমার্জন ও অশ্লীলতামুক্ত করে সমসাময়িক অন্য ধারা দিয়েছেন। বলা হয়ে থাকে যে লাবনির উৎপত্তি তামাশা থেকেই। এছাড়াও হনাজি বালা, প্রভঙ্কর এঁনারাও লাবনিকে নতুন উচ্চতা দিয়েছেন।

'পভাদস্' নামেও এক ধরনের নৃত্যকলা আছে যেখানে দৃশ্যত শিবাজী মহারাজের জীবনীভিত্তিক ব্যালে ধরনের নৃত্যশৈলী পরিবেশিত হয়। সংস্কৃতি ও মরাঠি ঐতিহ্যের মিশেলে 'পভাদস্' লোকনাচটিও যথেষ্ট জনপ্রিয় মরাঠা সমাজে।

তথাগত

বিমান মাজি

তথাগত বলিলেন—বৎস রাখাল, আগে আহার করো তারপর উপদেশ...

সেই সময় আমরা ক-জন তুমুল তরুণ সত্তরের উদিত অরুণ
আশুতোষের সামনে দাঁড়িয়ে চায়ের ভাঁড়ে দিচ্ছি চুমুক আর তুলছি
প্রবল তুফান, আমি বিমান সে তথাগত ওরা তিনজন অনূপ মিহির বাণীব্রত
আমরা সবাই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভাবীকাল আমাদের মনে রাখবে, রাখতে হবে
আমরা কেউ কবি কেউ আঁকি ছবি কেউ বা বিপ্লবী সংগ্রামে বিশ্বাসী।
আর আপনি মোহিত স্যার, সিটি কলেজের প্রফেসর, কবি ও নাট্যকার
কারো অধ্যাপক, কারো গুরু, কারো স্বপ্নের চন্দ্রলোকে অগ্নিকাণ্ড ঘটান;
পুরু লেন্সের চশমা পরেন কাঁচের ফাঁকে তাকান মুখে প্রসন্ন অনুভূতির হাসি
আমাদের দেখে দাঁড়ালেন, ডাকলেন—তথাগত শোনো, ক্লাসে যাচ্ছ না কেন?
কবিতা ছাপা হচ্ছে তো? সাহিত্যপত্রে? পরিচয়ে? এগিয়ে আসে তথাগত বিনীত
মেঘ না চাইতেই জল, অতল থেকে ভূতল থেকে ঝরে পড়ল অপার করুণা :
বাড়ি যেয়ো, কয়েকটি বই দেবো, এবার কিন্তু পরীক্ষায় বসো, বসতেই হবে...
বলেই পকেট থেকে বের করলেন একটি স্বর্ণমাষা, যেন বিম্বিসার দান করলেন
তথাগতের প্রসারিত হাতে, সমস্ত ঐশ্বর্য তার উবুড় করে দিলেন। তথাগত আজ নেই
দু-হাজার দু-সালে সকলকে ছেড়ে চলে গেছে, সম্প্রীতি স্যারও চলে গেলেন
ওরা দু-জনেই এখন স্মৃতি, দু-জনেই এখন অতীত, দু-জনেই এখন মৃত ;
হেমলক পান করে মরে গেল ওরা, অথচ দু-জনেই চেয়েছিল পান করতে অমৃত
তাদের কবিতায় নাটকে মেলামেশায় ভালোবাসায় দৈনন্দিন কথোপকথনে
কলেজ স্ট্রিট সব জানে, দেখে শোনে, তারপর কেমন নীরব হয়ে যায়।

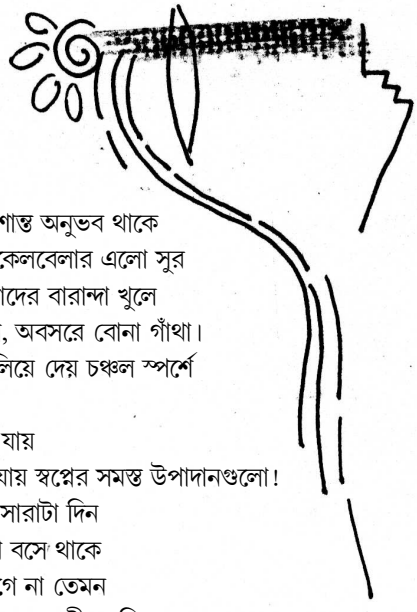

অনুভব

সংঘমিত্রা চক্রবর্তী

প্রত্যেকের বুকের গভীরে কিছু শান্ত অনুভব থাকে
একটা নরম আকাশের ছবি, বিকেলবেলার এলো সুর
থাকে রুটিনমাফিক ঘরকন্না, রোদের বারান্দা খুলে
বাতাসের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা, অবসরে বোনা গাঁথা।
কিন্তু যেদিন নিবিড়কে কেউ দুলিয়ে দেয় চঞ্চল স্পর্শে
আর গান আসে না মাটির
কবিতা লেখার আবেগ শুকিয়ে যায়
জীবন থেকে বহু দূরে পালিয়ে যায় স্বপ্নের সমস্ত উপাদানগুলো!
তখন অবসাদগ্রস্ত একটা মানুষ সারাটা দিন
ঘুম ঘুম চোখে গালে হাত রেখে বসে থাকে
কারও সঙ্গে ইয়ার্কি মারা ভাল্লাগে না তেমন
সামনে কেউ দাঁত বের করে হাসলেও ভীষণ বিরক্ত লাগে
ইচ্ছে করে মনের জানালা বন্ধ করে বসে থাকে একা একা
যত্ন করে না চুলের, নখে হলুদের ছোপ পড়ে থাকে
মুখে অবহেলার দুর্দিন শুরু হয়
ছেলেদের প্রতি মুগ্ধতার ঘোর ভেঙেচুরে পড়ে থাকে ডাস্টবিনে
শুধু দুঃখী দুঃখী মনে একঘেয়ে রান্নাবান্না পড়ে থাকে জীবনের সত্য!

আর পদ্য নয়

বাসন্তী সরকার

না, আর পদ্য নয়।
জীবনের প্রতি মুহূর্তে
কোনও মিল নেই।
জীবনবীণার তার
বাঁধা সুরে বাজে
না আর। থেমে যায়
মাঝে মাঝে স্পন্দন।
নিয়ম আর শৃঙ্খলার
কেউ ধারে না ধার
তাই কবিতাও আর
বাঁধাধরা পথে
চল্‌বে না বল্‌ছে।
সমাজজীবনে দেখি—
নেই কোনো মিল।
ঢালাও উপদেশ,
অঢেল প্রতিশ্রুতি,
নীতিকথা প্রচুর—
শুধু নেই খাদ্যকণা।
শাসক এখানে শুধু
শোষকের সেবায় নিরত?
একদিকে অসীম প্রাচুর্য্য,
অন্যদিকে ভয়াল দুর্ভিক্ষ!
কেমনে মিল হয়?
যতদিন না হবে
এসবের সমাধান?
কেমনে বলতো
লিখি কবিতা ছন্দ...
তাই আর পদ্য নয়।

দিন পড়ে আছে

নাসের হোসেন

আমাদের যতটা ভালোবাসা আছে বলে মনে হয়
আমরা তার থেকে অনেক অনেক বেশি ভালোবাসতে
পারি, কেন তা করি না, বলা খুব মুশকিল
কেবল এটুকু বলা যায় এই 'অনেক অনেক বেশি
ভালোবাসা'টা আমরা ভবিষ্যতের জন্য জমিয়ে
রাখি। যেমন 'অনেক অনেক বেশি দুঃখ'ও আমরা
জমিয়ে রাখি। এখন বেশি দুঃখ পেতে নেই, বেশি
দুঃখ পাওয়ার জন্য দিন তো পড়ে আছে, অপেক্ষায়, ভায়া!

জলছবি
দীপা বিশ্বাস

তোমাকে বলেছিলাম ভালোবাসতে পারবে তো?
আর কিছু নয়, ভালোবাসা। নকশি কাঁথা
জড়িয়ে নিবিড় নিদ্রা দুজনে, চেয়েছিলাম
কৃষ্ণ আকাশের বুক চিরে যখন অট্টহাসে
ফেটে পড়বে কালভৈরব—তোমার রোমশ
বুকে আশ্রয়...
চেয়েছি অনিঃশেষ মেঘবৃষ্টি রাতে সান্নিধ্য
তোমার। উদ্‌গত অশ্রু মুছে নিতে চেয়েছি
প্রিয়তম তোমারই হাতে। অপমান-জর্জর
হৃদয় মাথা রাখতে চেয়েছে তোমারই বুকে

অবসরে শুনতে চেয়েছি তোমার বলা, সেই
সব ঠাকুমার গল্প—চাঁদের করুণ গান
ডোবাতে চেয়েছি মুখ ভালোবাসার বুদবুদে...

একদিন বলেছিলাম তোমার বুকটা রেখে দিও
কাঁদবার জন্য, মনে পড়ে প্রিয়?

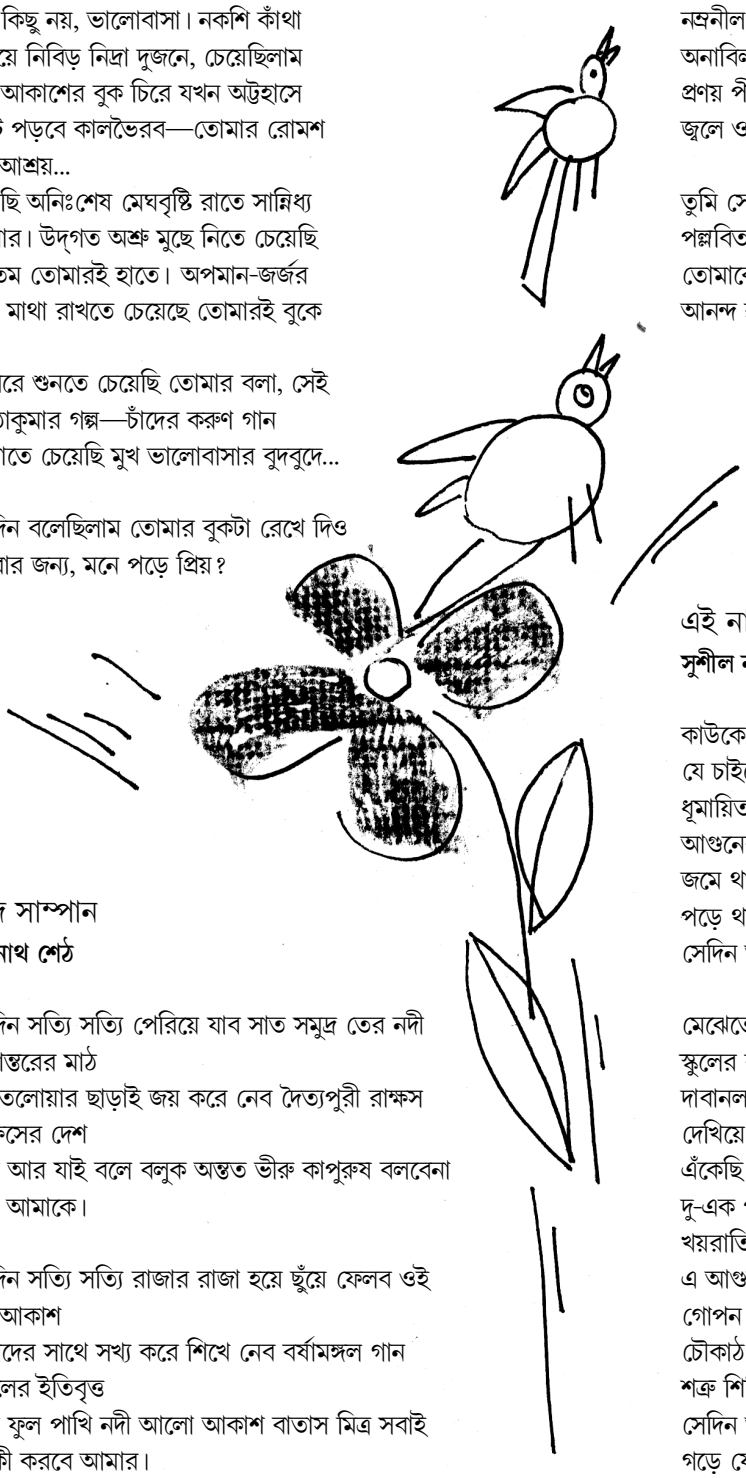

রোদ সাম্পান
প্রাণনাথ শেঠ

একদিন সত্যি সত্যি পেরিয়ে যাব সাত সমুদ্র তের নদী
তেপান্তরের মাঠ
ঢাল তলোয়ার ছাড়াই জয় করে নেব দৈত্যপুরী রাক্ষস
খোক্ষসের দেশ
তখন আর যাই বলে বলুক অন্তত ভীরু কাপুরুষ বলবেনা
কেউ আমাকে।

একদিন সত্যি সত্যি রাজার রাজা হয়ে ছুঁয়ে ফেলব ওই
নীল আকাশ
মেঘেদের সাথে সখ্য করে শিখে নেব বর্ষামঙ্গল গান
লাঙলের ইতিবৃত্ত
তখন ফুল পাখি নদী আলো আকাশ বাতাস মিত্র সবাই
কে কী করবে আমার।

একদিন সত্যি সত্যি সমস্ত আঁধার ঘুচিয়ে ভাসিয়ে দেব
আলোর রোদ সাম্পান।

আয়ু পথে
দেবাশিস প্রধান

আমার গৃহশোভা,
নম্রনীল পদ শোভা
অনাবিল তুমি শ্বেতা
প্রণয় পীরিত গেঁথে
জ্বলে ওঠো বারবার

তুমি সে আঢাকা যোনি
পল্লবিত কুসুমের
তোমাকে নিয়েই
আনন্দ রচনা করি

নামি দামি আসবাবপত্তর
আলো অকাতর
জলের চুড়োয় খলবল্‌
প্রখর শরীরে
পল অনুপল...

শিল্পের আধার
রঙিন নগর
বাঁচি-মরি আমরণ
আলোঘরে নহরপহর...

এই নাও, এঁকেছি অভ্যন্তর
সুশীল নাগ

কাউকে ফেরাবো না,
যে চাইবে জ্বলন্ত অঙ্গার
ধূমায়িত অঙ্গার থেকে একদিন
আগুনের লেলিহান ছুটে আসবে
জমে থাকা অন্ধকারে,
পড়ে থাকা অন্যায় পোড়াতে একদিন
সেদিন আর খুব বেশি দূরে নয়।

মেঝেতে চারকোল দিয়ে
স্কুলের বালক
দাবানল এঁকে সব্বাইকে
দেখিয়ে বলছে : এই দ্যাখো
এঁকেছি অভ্যন্তর
দু-এক পশলা অনুদান
খয়রাতি, পুরস্কার, পারিতোষিকে
এ আগুন নিভবে না কোনো দিন।
গোপন আগুন একদিন
চৌকাঠ পেরিয়ে ঢুকে পড়বে
শত্রু শিবিরে।
সেদিন আরো এক জতুগৃহ
গড়ে ফেলবে ইতিহাস
যাবতীয় অন্যায় পোড়াবে
মেঝেতে এঁকে রাখা
আপাত নিরীহ ওই দাবানল।...

তিনটি কবিতা

অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

১.
নিতে হবে। দিতে হবে। ফিতে
কেটে তুমি ভেবেছো কি জিতে
যাবে? ভুল! হবে না বিজয়ী—
যে লড়াই অ্যাত রক্তক্ষয়ী
তা কি অত সহজেই জেতা যায়?

২.
অসম্ভব শীত। পদাবলি
এখন চলে না। কুতূহলী
জনতার অভিমান জেনে
নিতে হবে তোমাকে তো মেনে
সব দাবি। সিন্দুরের চাবি
তবেই উদ্ধার। হাবিজাবি
প্রলাপনে লাভ নেই। ওতে
সময় হারায় উল্টো স্রোতে।

৩.
রাবণকে রাম বলো যদি
রাবণ রাগবে। নিরবধি
রামকে রাবণ বলে গেলে
রাম ক্রুদ্ধ হয় না। বিকেলে
যা তাজা তা পরের প্রভাতে
বাসি হয়। তোমাদের হাতে
দেবার থাকে না কিছু। ঘরে
রাম রাবণের পুজো করে।

বসন্ত দুলৌড়

যযাতি দেবল

এখন আঁধার নাচে গ্রাম ও শহরে
ত্রস্তরাত কাঁপে সবুজ হায়নার চিল চিৎকারে—
এ সময় পাহারা বাড়াও নজরদারিতে আনো শত্রুর গতাগতি
সজাগ কর বন্ধুদের; হেতালের ব্যবহার শেখাও।

উত্তর-দক্ষিণ জুড়ে ক্ষমতার স্বৈর দাপাদাপি
এ-সময় যৌবনের হাতে দাও প্রদীপ্ত নিশান
দাও ইতিহাস, স্মৃতিকথা; শহিদের দিনলিপি।

খাল পেরিয়ে যাওনি কতদিন পলাশডাঙায়
শঙ্খচিল শোনায়নি তারুণ্যের গান
কাঁসারোদ গায়ে মেখে দেখনি শারদ দাঁসাই

যুব উৎসবে তোল যৌবনের দারুণ হুল্লোড়
বাহা পরবের নাচ খুঁজে পেলে ছন্দের মহিমা
ঘুম ভাঙ্‌বে জঙ্গলের; মাতাল হবে বসন্ত দুলৌড়

অচিন্ত্য, চোখকান খুলে রাখিস

রূপচাঁদ

অচিন্ত্য, অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটছে আজ চারদিকে,
এক অদ্ভুত আঁধারে ঢেকেছে আকাশ। চোখকান
খুলে রেখে পথ চলিস, কথা বলিস সন্তর্পণে,
বড্ড ভয় এখন আমার, খুব বেশি চিন্তা
তোদের জন্যে, কারণে অকারণে নেমে আসা
আক্রমণে আমরা বিপর্যস্ত প্রতিটি মুহূর্ত,
ধ্বস্ত প্রতিটি দিন, সন্ত্রস্ত দিনের যাপনে।

যারা মুক্ত হাওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিল একদিন,
প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে প্রলুব্ধ করেছিল আমাদের,
তারা কথা রাখেনি। স্বপ্নের হন্তারক তারা
রুদ্ধ করেছে আমাদের জীবন, আমাদের সংস্কৃতি,
অচিন্ত্য, এমন প্রতারণা প্রবঞ্চনা স্বপ্নেও ভাবিনি,
কখনো ভাবিনি, পালক হতে পারে বিশ্বাসঘাতক,
বলতো, কীভাবে বাঁচব এই বিপন্ন দিনে?

তাই সতর্ক থাকিস, যেমন, অরণ্যে থাকে হরিণশাবক
সন্ত্রস্ত সজাগ, হিংস্র বাঘের থাবা করে প্রতিহত
সুকৌশলে, তেমনি, উদাসীন নয়, চেতনায় ঋদ্ধ মননে
সামনে এগিয়ে যেতে হবে, প্রতিহত করতে হবে
ঘাতকের যাবতীয় আক্রমণ। সামনে কঠিন লড়াই
রুটির জন্যে, ইজ্জতের জন্যে, জীবনের জন্যে
অচিন্ত্য, এই লড়াইটা জেতা খুবই জরুরি।

তাই, চোখকান খুলে রাখিস,
পথ চলিস সাবধানে...
অচিন্ত্য,

অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটছে আজ চারদিকে।

সাতসকালেই

ঝর্না মুখোপাধ্যায়

এক বিঘত আবির রোদ আঁচলে জড়িয়েছিল
গভীর আচ্ছন্নতায় খানিক সহবাস
ছন্দ করতলে।
শরৎ ছাপানো নদী-ছলাৎছল
সান্ধ্যভাষায় কথা দিয়েছিলাম।
লাল ফলকখানা শব্দহীন
আগামীর প্রার্থিত রঙমশাল
নিভাষায় পৌঁছে যাই... সাতসকালেই
যোগসূত্রের—
আবির রোদের গান।

রক্তঋণ

উজ্জ্বল কুমার ঘোষ

ভাইয়ের রক্তে ভাষার রোপণ
স্বাধীন বাংলাদেশ
হায়নাদের আসা যাওয়া
হয়নি আজো শেষ।
দিন প্রতিদিন ঝরছে যে 'খুন'
হৃদয় মাঝে লাগে
আজ মিছিলে যাবো আমি
হাঁটবো সবার আগে।
সুদীপ্ত ভাইয়ের ক্ষত বুকে
থাকবো সবার সাথে
দু-হাত তুলে এগিয়ে যাবো
সাহবাগের পথে।
ভয়টা কিসের, শুধবো এসো
ভাইয়ের রক্তঋণ
অন্ধকারের পর্দা ছিঁড়ে
আনবো নতুন দিন।

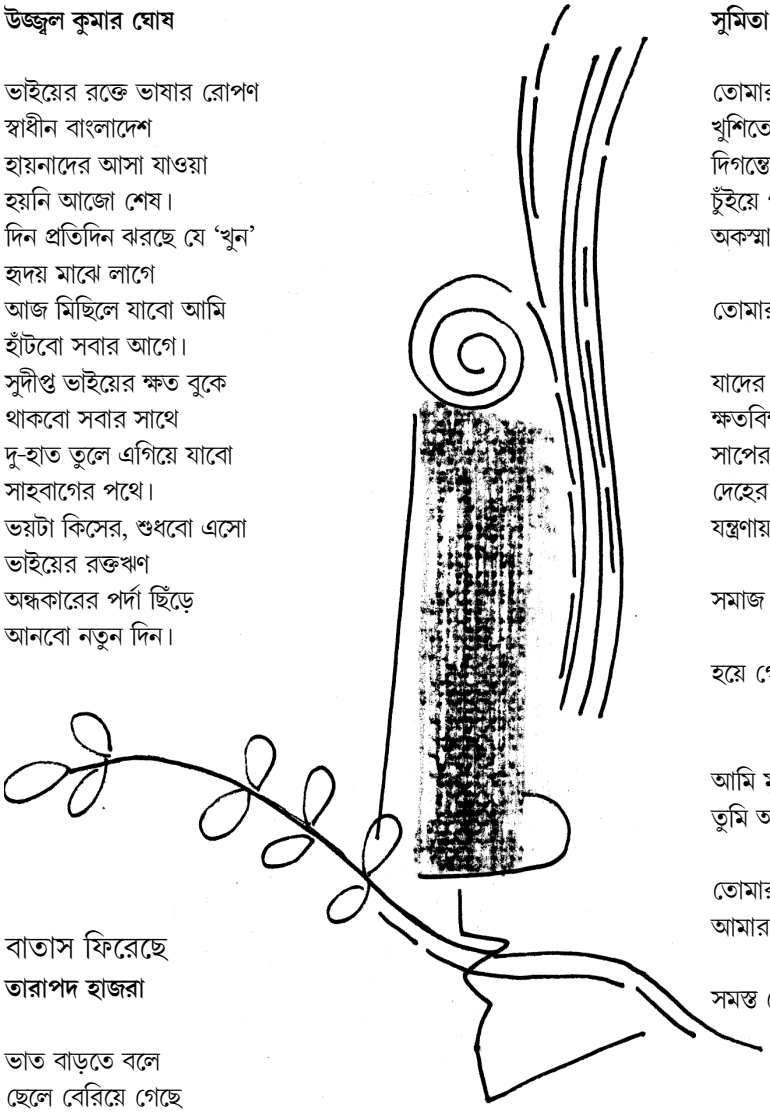

বাতাস ফিরেছে

তারাপদ হাজরা

ভাত বাড়তে বলে
ছেলে বেরিয়ে গেছে
মা ভাত বেড়ে বসে আছেন
রাত বাড়ছে...

সাদা জুঁই ফুল দেখবে বলে
সারা বছর মাঠ পাহারা
মাথার উপরে রোদ্দুর
মাথার উপরে বৃষ্টি
মাথার উপরে হিমবাতাস...

স্বপ্নরা ছুঁয়ে থাকে মনে
ভরবে ধানের গোলা
নবান্ন উৎসব, নতুন ধানে।

ছেলে আর ফেরে না
ফিরে আসে বাতাস
ফসল লুঠ করছে কারা।

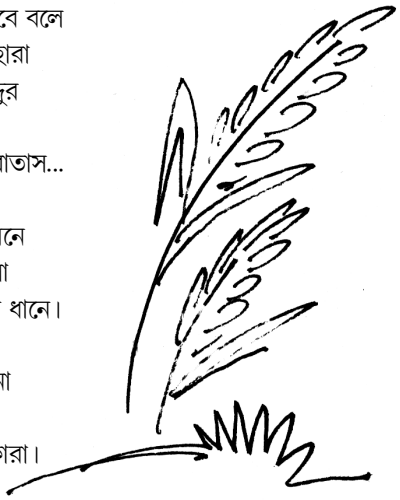

তুমি তো আছ

সুমিতা মুখোপাধ্যায়

তোমার বুকে মুখ
খুশিতে ভরে দিলাম।
দিগন্তে পূর্ণিমার চাঁদ,
চুঁইয়ে পড়া জ্যোৎস্না, আমার সারা শরীরে।
অকস্মাৎ কালো মেঘে ছেয়ে যাওয়া আকাশে
হঠাৎ আঁধার।
তোমার বুক থেকে আমায় কেড়ে নিল
একদল শ্বাপদ—
যাদের মান এবং হুঁশ আছে।
ক্ষতবিক্ষত হল আমার দেহ
সাপের মতো হিস্ হিস্ শব্দে—
দেহের নির্দিষ্ট অঙ্গে, মারল ছোবল
যন্ত্রণায় নীল হওয়া শরীরটা, ছুঁড়ে দিল আঘাটায়।
তবু আমি বেঁচে গেলাম।
সমাজ সংসার ছি ছি করে, ঠেলে দিল দূরে।
সহজ সরল ঘরের মানুষটা—
হয়ে গেলাম অদ্ভুত এক ঘৃণার বস্তু।
অবহেলা অথবা সহমর্মিতার শব্দগুলো
সবই ওই যন্ত্রণার সময়কে কেন্দ্র করেই।
আমি মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে চেয়েছিলাম।
তুমি আমায় তোমার আঁচলতলে টেনে নিলে
'মা'
তোমার বুকে মুখ রেখে সকল ব্যথা ভুলতে চাই আজ
আমার শরীর জুড়ে এখন তোমার স্নেহের পরশ,
জ্যোৎস্নার ধারা হয়ে ঝরে পড়ছে
সমস্ত বেদনা থেকে মুক্ত আমি,
তুমি তো আছ 'মা'।।

বিপর্যয় ৩

তপন দাস

ভেঙে পড়েছে বাবা
ডালপালা সমেত ভেঙে পড়েছে গ্রাম
স্রোত বয়ে যেতে যেতে থমকে গেছে
নির্বাক স্রোতা আমি শুনছি কৃষ্ণনাম

পাখিদেরও লুকোবার জায়গা নেই
কোথায় নেবে বিশ্রাম?
সারা ঋতু চক্কর কেটে রক্ত ঠোঁটে
দুর্দিনে হৃদয় কেঁপে ওঠে

কাকে জানাব শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ

অন্তরাত্মা, সন্দেহ নেই জটিল ক্ষয়রোগ!

শত্রুপুরীতে

অমল কোঙার

খাদ্যের জন্য অস্থির হয়ে ওঠা শরীর।
নারীর যত্নে পূর্ণতা পেতে চাওয়া মন।
মিথ্যা আশ্বাসে নিশ্চিন্ত হতে চাওয়া কর্ণকুহর।
বিনোদনী যাদু রঙে আটকে থাকা দুটি চোখ।

কিন্তু তোমার তো বন্দুক তুলে নেওয়ার কথা
শ্রেণিমুক্তির অনিবার্য সংগ্রামে।
তোমার তো দিন যাপন কাকদ্বীপ থেকে ডেবরার মাঠ ভেঙে
অবুজমার-জঙ্গল পেরিয়ে বলিভিয়ার সৌধে।
তুমিই তো পথ চিনতে চাও
চে-র দৃপ্ত পদচারণার চিহ্ন খুঁজে খুঁজে।
তুমিই তো শ্রেণিচ্যুত হবে
ভ্লাদিমিরের ভাষণে কিংবা লংমার্চের কুচকাওয়াজে।

তাই ক্ষুধা তুমি, যতই দীর্ণ করো শরীর
তাই নারী তুমি, যতই জ্বালো বাসনা প্রদীপ
আমি তুমি, যতই বাড়তে চাও বুর্জোয়া আবেশে
যাদু-রং যতই নেশা জমাও যৌনতার কুবাসে
সব পাঁক পার হয়ে আমি রোজ হাঁটবোই মুক্তির মিছিলে।
সাম্যের দাবিতে, লাল লাল লাল,
লাল নিশান কাঁধে।

ভোরের উদ্দেশে

রমেন দাস

ডানার আগুন ঢেকে কয়েকটি নির্লিপ্ত পাখি
গুহার অন্ধকারে জেগে আছে
সকালের খোঁজে।
আকাশে এখনো মেঘ : মুক্ত বাতাস বহুদূরে
খণ্ড আলোয় শুধু বহমান রাত্রির নদী—
তার জল ঢেউ নিয়ে এগিয়েছে অসীমের দিকে।

আঙুর বাগানে আজ পুতুলের সঙ্কীর্তন;
বাঘহীন জঙ্গলে ফেউ ডাকে, ছায়ার আড়ালে
আর এক মুণ্ডুহীন, সমারূঢ় রথের ওপর
বল্গাহারা অশ্বের হ্রেষাধ্বনি
প্রাক্ সন্ধ্যাবেলা;

ডানার আগুন নিয়ে জেগে থাকা পাখিগুলি জানে
গুহার বাইরে কাল ভোর হবে...

জগতের রঙ্গমঞ্চে

তাপসী আচার্য

[নাট্যকার বিশ্বদেব দত্তকে নিবেদিত]

জগৎ মাঝে কিছু তো ভাই থাকবে না
কীর্তি ছাড়া কেউ তো মনে রাখবে না
জীবনযাপন মেটে পুতুল নশ্বর ভাই
আপন কাজের চিহ্নটুকু সত্যি তাই
মহাকালের ক্লান্তিবিহীন অমোঘ স্রোতে
প্রতিটা দিন বেঁচে থাকেন সাধনব্রতে

এই ঘটনার পরম্পরা প্রেক্ষাপটে পর্দা সরে
স্পট লাইটের আলোয় তখন মঞ্চ ভরে
মঞ্চে যখন দাপিয়ে বেড়ায় ঐ কুশীলব
রাজা-বাদশা-ভিখারীদের মুখোশ সব

পরিচালনার সেতুবন্ধ পূর্ণ হলে
চেয়ে থাকেন লক্ষ্যভেদী চোখটা মেলে
এই তৃপ্তির অমল হাসি তিনিই হাসেন
নাটকটা যে প্রাণের চেয়েও ভালোবাসেন।

হলুদ পাতা

সোমনাথ প্রধান

হলুদ পাতা খঞ্জনাকে বলল—নাচো!
এবার যেতে যেতে উড়ানের পথে
আমার রুগ্ন ক্লোরোফিলের জন্য
মধুরতর স্মৃতি নিয়ে যেতে দাও
হলুদ পাতা খঞ্জনাকে বলল...

শেষ ভালো চায় সবাই
নিজেই আয়েসে নিজের শেষ
দেখে যেতে চায়
ধুলোর স্মরণে এলে ধুলোও যেন বুঝতে পারে
কী বাঁচা সে বেঁচে এলাম গাছের জলসাঘরে!

চিত্রকর

তন্ময় ভট্টাচার্য

একটা সত্যি কথা বলতে শুরু করলে
চারদিক মেঘলা আকাশ
একটা প্রেমপত্র লিখতে শুরু করলে
সব মেয়েরাই বনলতা সেন
আর যদি শুরু করো কাস্তে আঁকতে
নীলসাদা খামে খোলা চিঠিতে সমন আসতে পারে
সঙ্গে 'সি পি এম' তকমা ফ্রি
আর বাড়ির মেয়েটার ইজ্জত লুঠযোগ্যতার ঘোষণা
কাস্তের পাশে হাতুড়ি এঁকে ফেললে
মা-মাটি-মানুষ ব্র্যান্ডের নতুন গিলোটিন

তবু তৌলিক, ক্যানভাস ছেড়ো না
আমি শহিদের মায়ের সিঁদুর কৌটো জমিয়ে রেখেছি
তার বৌ-এর শয্যা থেকে কুড়িয়ে রাখছি গোলাপ পাপড়ি
আর বাগান ভরেছি রক্তকরবীর চারায়

এসো চিত্রকর, রাঙাও আপন খুশিতে

মুহূর্ত

দীপক হোতা

তোমাকে যখনই মনে মনে স্পর্শ করি
প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে; নিভন্ত কোষ
মুগ্ধবোধ গান হয়ে যায় ঘুমন্ত কথাগুলো
আপন আনন্দে সৌন্দর্যের ছায়া পড়ে—
জীর্ণ দেওয়ালে—বিমূর্ত হয় প্রতিভাস আলোক-আঁধারে
লাবণ্য মসৃণ আবেগে ঝরে পড়ে শরীরী বল্কল
হৃদয় ক্যানভাসে এঁকে রাখি স্মৃতির সঞ্চয়
কমনীয় মরা জ্যোৎস্নায় বিচ্ছুরিত আলোর দর্পণে
প্রতিটি শিরাশক্তি মেতে ওঠে প্রক্ষেপিত দেহের বিন্যাসে
তোমাকে যখনই স্পর্শ করি
প্রতিটি খাঁজের ভিতর মেতে ওঠে রক্তজালিকা
প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয় বেঁচে উঠি যৌনতার গভীর গোপনে
ভাঙতে ভাঙতে নিজেকে টেনে নিয়ে যাই নদীর নৈঃশব্দে
গভীর বিশ্বাসে ভর করে সবুজ দ্বীপের আঙিনায়
শুয়ে থাকি রাত্রির গভীরে অনিমিত্ত রমণীয় প্রেমে
এভাবেই, কখনো তোমার শীতল আঙুল ছুঁয়ে থাকি নীরব অভিমানে
ছিন্নভিন্ন পাপড়ির স্তবকে আক্রান্ত কীটের দংশনে
যেখানে যত্রতত্র পড়ে থাকে দুঃখের চক্ষুজল বিছানার ধবধবে চাদরে।

পুণ্যাহ

বিদ্যুৎ মোদক

একই নিয়মে বুঝি শেষ হয়
তবু কেন হয় নাকো শেষ
তবে কি শুরুই হয়নি!
তাই মেলেনি শেষ।

অদ্যাবধি চিরচেনা সেই একই দিন
কেটে ছিঁড়ে নাম
হয়েছে সকাল, দুপুর, বিকেল
ক্রমে দৃশ্য-হারা গাঢ় অদৃশ্য
নেমে আসে সন্ধ্যা-নামে,
গোধূলির নিচোল জড়িয়ে
প্রান্তরের আঁধারে চলে যায়
নিঃশব্দে, মূক অভিমানে।
রেখে যায় বাতি,
প্রগাঢ় অচেতন শ্রান্তি
কথা হয় ঘুমের সাথে।

অপরূপ বড় অদ্ভুত অনন্য অভিন্ন
দেখা যায়, বোঝা যায়, না যায় ধরা
দেখা অপলকে মিলায়।
আচম্বিতে ধরা দিলে
ক্ষণিকের কোন সুখ
উন্মত্ততায় চলে খোঁজ
সে বৈভবের অরূপের মাঝে
ফিরায়ে আনে অধরা দেখাকে পুনঃ
দৃশ্য-ধারা দৃশ্য-পটে অবিরাম
সেই একই নামে।
অশান্ত অবুঝ মন ছুটে চলে
হাটে, বাটে, গৃহে, গোঠে
অবিশ্রান্ত।

সারা দিনমান বয়ে যায়
খুঁজে ফেরে ক্লান্তিহীন, তৃপ্তিহীন
সদা দণ্ডায়মান
নিমেষহীন সচকিত,
'কোথা সে, কোথা সে সুখ,
দাও না ধরা, হয়ো না বাঁধন-হারা'
আকুল করে ধরণীর ধূলি
নিশীথ দিন
অনাগত কালের যাত্রী হয়ে।

রাত্রি অবসানে নিয়ে আসে
ঊষার আলোয় উদ্ভাসিত
প্রতিদিন চিরচেনা একই প্রভাত
সপ্রাণ জীবন যাপনের সামান্য
স্পর্শে হয়ে যায় কেন এমন পুণ্যাহ!

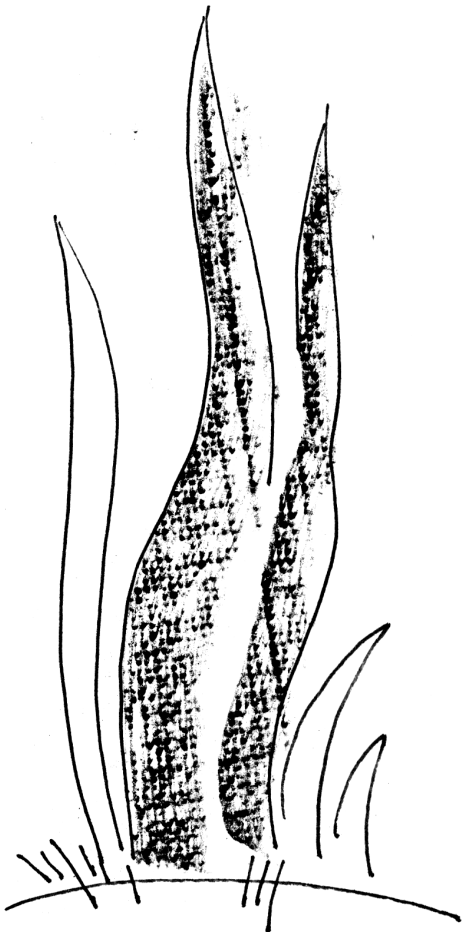

প্রত্যয়ের সূর্যোদয় আমরা দেখবোই

বিকাশ বিশ্বাস

চারদিকের অদ্ভুত নীরবতার অহল্যাভূমি...
আর নয় মৌনতার গুণ্ঠন
কর্ষিত হোক সোনালি শস্যের শাশ্বত স্বপ্নে।

নীড়হারা পাখির স্বপ্নভঙ্গের
হতাশ সুরের আর্তনাদ নয়
অভিযানের অঙ্গীকারে
সমবেত সঙ্গীত ঝরুক
তোমার আমার সকলের কণ্ঠে
উত্তরণের গান, জীবন জয়ের গান।

নাবিক তুমি দিশা দেখাও
সমুদ্রের গান গেয়ে।

একা একা বাঁচার নীরব চেষ্টা
সে তো গ্লানির জীবন বয়ে বেড়ানো...
বরং রৌদ্রের ডানা মেলে
পাখিরা উড়ুক সুনীল দিগন্তে
ভোরের বার্তা ছড়িয়ে দিতে।

এসো ঘুরে দাঁড়াই, আতঙ্ক উপেক্ষা করে
পেছনের সাথীকে ডেকে নিই;
প্রত্যয়ের সূর্যোদয় আমরা দেখবোই।

এখানে-তাহলে

উদয়শঙ্কর অধিকারী

এখানে সকালে নামে বীভৎস রাত্রির অন্ধকার
এখানে বাতাসে শুনি কলজেভেদী তীব্র হাহাকার
এখানে অবিরাম ঝরে চোখের জলের কাতরতা
এখানে হায়েনার তপ্ত লালায় ঘৃণ্য লোলুপতা
এখানে শিশুর পাংশু মুখে আতঙ্কের রুদ্ধশ্বাস
এখানে মানব মন টুকরো করে নিদারুণ অবিশ্বাস

তাহলে শুরু হোক সর্বপাপঘ্ন সূর্যের আবাহন
তাহলে শুরু হোক চেতনায় শান দেওয়া আয়োজন
তাহলে বার্তা যাক্ জীবনবাজির সমর
তাহলে বার্তা যাক্ মরণ-বাঁচনের অলঙ্ঘ্য সন্ধির
তাহলে আকাশভর্তি মেঘগুলো হোক জমাটি পাথর
তাহলে খান্‌খান্ করা যাক্ শয়তানের বুকের পাঁজর

আমার শানিত-চেতনার কবচকুণ্ডলে
বিস্মৃত মনের মুক্ত প্রাঙ্গণতলে
কোটি-কোটি মানবিক মুখ হাঁটে বিজয়মিছিলে।

অন্ধকারের পটুয়া

নিগমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

দূর-অন্ত আকাশের দিকে উড়ে যায় নিরন্ন-বিবেক মানুষের
কবিসত্তা রুদ্ধবাক্, খুঁজতে থাকেন ভালোবাসা তাঁর, অবহেলিত,
অবাস্তব, অবাঙমনসগোচর

দেখতে থাকেন আকাশের এককোণে র‍্যাম্পের মডেল কিংবা
রূপস্পর্ধী উদ্ভট লুব্ধক...
এ ঘ্রাণ কি পেয়েছিল সেই নীলকণ্ঠ পাখি, কোনো বসন্তের
ভোরে? বটের কোটরে আজ শুধু মাছরাঙা পাখি ঘোরে সর্বত্র
সর্বকালের অতীত— নেমে আসে অন্ধকার অথবা শীতার্ত স্বকাল

অথচ প্রেমরিক্ত মদ্যপ যুবক খুঁজে চলে তার অলস
অতীত অথবা ছেলেবেলা... সৎবাপের নৃশংসতা মনে পড়ে তার
অতএব জিঘাংসা জেগে ওঠে ভ্যালেন্টাইন্স ডে তে—কী আশ্চর্য
মাত্র একযুগ আগে এরাই তো... ছি, ছি, —না, না, এরা নয়
বোধহয় এদের আগের প্রজন্ম মেতে উঠত রক্তঝরা একুশের
ডাকে—সহর্ষ উদ্দাম হিল্লোলে অথবা হে মার্কেটের
রোমন্থনে প্রতিবাদের শূন্য মুঠি ছুঁড়ে দিত মে-ডে'র ডাকে

আজও বাজে হ্যামলিনের বাঁশি—ওরা শোনে কৃষ্ণের
বাঁশির বদলে কীচকের হাসি—তাহলে? সবাই কি
ভুলে গেল রক্তঝরা পলাশ শিমুল কিংবা কৃষ্ণচূড়া?
অদ্ভুত অবাক জলপান নিরুদ্ধ বিশ্বাসে আর এক নিঃশ্বাসে

তবুও অবাধে চলে প্রতিশ্রুতিময় এক আদিম
সহবাস প্রোষিতভার্যের সঙ্গে—মন দেওয়া-নেওয়া নয়—
শুধুমাত্র দেহলিপ্সা প্রাক-দ্যুতি উত্তর-অয়নে—
খসে খসে পড়ে, থামে না সে জলতরঙ্গ বাসনার বিপ্রলব্ধ
ঝড়ে... এ কোন আঁধার নেমে এল পৃথিবীর বুকে
তবে কি রাতের ঈশ্বর শুধু কলঙ্কের ভাগীদার? সৌমিকের
নেই কোনো দাম?

কবি রুদ্ধবাক... তবুও ভোলেন নি হাসতে এখনও
ভোলেননি বাউলের গান—ভাবেন এ দ্যুলোক মধুময়,
মধুময় ধরণীর ধূলি—কী আবেশ বসন্তের—কী হুজুগে
মেতেছে রঙ্গোলি...
কিন্তু চোখের সামনে খানচুর বিপ্লবের গান—ডুবে যাচ্ছে
রাত্রি একা ঘন অন্ধকারে, বেপথু নবমী
স্রষ্টা শুধু করে আর্তনাদ—এ কোন আত্মরতির অহংকার
ঢেকেছে পৃথিবী—একটা ঘুমে ঢুলে ঢুলে পড়ে—দিকে
দিকে অন্যায্য আগমনী—অন্ধচাখে পার্কিনসনস্-হাতে
এঁকে যাচ্ছে সে দুরন্ত ছবি... বিবেক পটুয়া একা একা

জীবনের অন্ধকার—ঘন অন্ধকারে... ভেসে আসছে
কান্নার রোল... দিক্-অন্ত, দূর-অন্ত থেকে
এ বীভৎস পৃথিবী ছেড়ে, এ বিপন্ন বসন্ত সন্ধ্যায়
কোথায় পালাচ্ছেন কবি? চেয়ে দেখুন
সমাজে যে নেমেছে গোধূলি....

কবিতার মিছিল

আবেদ আলি মল্লিক

স্তব্ধ নিঃশব্দতায় ক্ষুরধার শাণিত হয় চেতনা
কবির চেয়ে অনেক বেশি মুখর হয় কবিতা।
কবিতার মুখরতা পাল্টে দ্যায় সবকিছু,
এসো সবকিছু পাল্টানোর জন্য কবিতারা মিছিল করি
রাজপথে পথে গ্রামে গ্রামান্তরে।
রাজপথ হয়তো কবিতার রক্তে ভেসে যাবে—যাক,
মানুষ দেখুক কবিতাকেও ক্ষমা করেনি ওরা।
ওরা আমাদের চেয়েও ভীত সন্ত্রস্ত—কবিতায় কবিতার মিছিলে
সেই জন্যই ওরা দুনিয়ার দেশে দেশে কবিদের ফাঁসি দ্যায়—
খুন করে নির্মম নৃশংসতায় অবলীলায়,
পরিচিতির ভয়ংকরতায় কবিতার খুনে হাত রাঙায়—কবিদেরও।
তবু কবিরা বেঁচে আছে—বেঁচে থাকবে কবিতার মিছিল হবে—আমরণ
যতদিন শাসকের অন্যায় অত্যাচার নৃশংসতায় ভরে যাবে
ওদের বন্দুক আর মিশাইল চলবে—ততদিন চলবে
রাজপথে পথে নিরবচ্ছিন্ন কবিতার প্রতিবাদী মিছিল—চলতে থাকবে।
এসো কবিতারা—মিছিল করি এখন।।

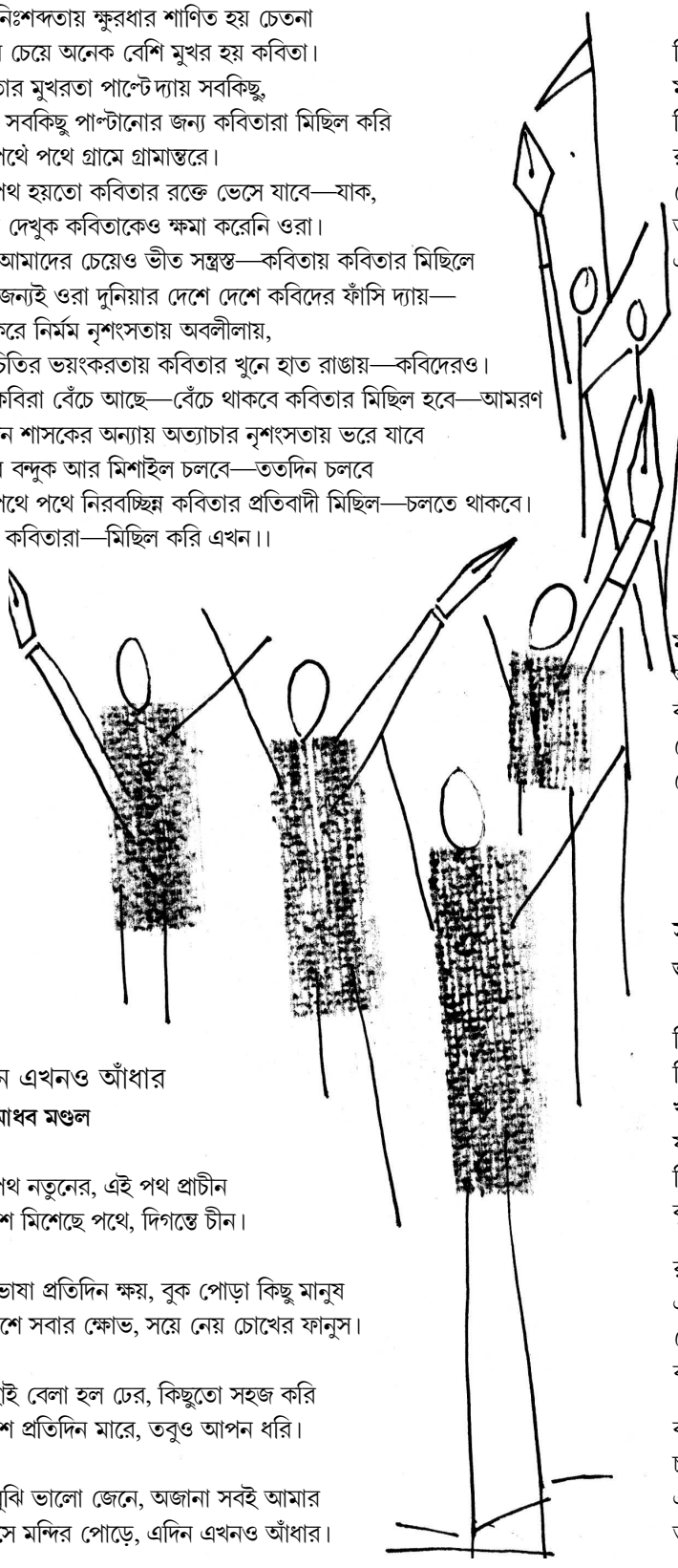

এদিন এখনও আঁধার

রাধামাধব মণ্ডল

এই পথ নতুনের, এই পথ প্রাচীন
আকাশ মিশেছে পথে, দিগন্তে চীন।

এত ভাষা প্রতিদিন ক্ষয়, বুক পোড়া কিছু মানুষ
আকাশে সবার ক্ষোভ, সয়ে নেয় চোখের ফানুস।

দূর ছাই বেলা হল ঢের, কিছুতো সহজ করি
আকাশ প্রতিদিন মারে, তবুও আপন ধরি।

এই বুঝি ভালো জেনে, অজানা সবই আমার
বিশ্বাসে মন্দির পোড়ে, এদিন এখনও আঁধার।

আমার মৃত্যু শিয়রে

মিলন শূর

(প্রয়াত ২৮.৯.২০০৯)

কিছুক্ষণ হল আমার মৃত্যু হয়েছে,
মৃতদেহ ছেড়ে চলে এসেছি,
কিন্তু কী মোহ পৃথিবীর!
রবীন্দ্রনাথেরও বিশ্বভুবন
ছেড়ে যেতে অনিচ্ছা ছিল—
তবু যেতে হয়েছে।
এই তো নিয়ম।
তবে কবিতা লেখার কী দরকার?
আছে বাবা আছে, একটু অপেক্ষা কর।
যারা আমায় ভালোবাসতো তারা এসেছে,
বাসতো না যারা তারাও এসেছে।
মন্তব্য চলছে—
ধীরে ধীরে ফিসফিস করে বলছে,
ন্যাকামি করে গেল, বড় বড় দাড়ি-চুল,
বিয়ে করলো না।
তবে এলি কেন এ ধরায়?
যেন আমার ইচ্ছায়!
মৃতদেহ থেকে কিছু দূরে কয়েকটি লোক দাঁড়িয়ে—
আধ-ময়লা পরিচ্ছদ। পরিচিত।
কাঁদছে আর বলছে—"আমাদের কথা শুনতো,
লোকটা বলতো—অভাব, দারিদ্র সেই দিন যাবে,
যেদিন মেহনতি মানুষের সমাজ তৈরি হবে।"
কোথায় সে সমাজ? দেখতে পেলাম না তো,
দুঃখ রয়ে গেল।

সন্ধ্যার আঙিনায়

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

দিনের চেয়ে রাত্রি আমার কাছে বিশেষ মোহময়—
নিজের অস্তিত্বের সন্ধান করা যায় সহজে—
খুলে দেয় অনেক সম্ভাবনা দিনের আলোয়
যা পুড়ে যায় তীব্র কোলাহলে—
চিৎকার-দৌড়ঝাঁপ-ট্রামে বাসে
কুস্তি করে ওঠা হাজিরায় খাতার চোখ রাঙানোয়।

রাস্তার বাতিগুলো যখন আস্তে আস্তে জ্বলে ওঠে
একেকটি ফুলের পাপড়ি মেলার উৎসাহে
হেঁটে চলি আলো আঁধারি পথে ফুরফুরে
বাতাসের আহ্লাদি টানে।

কতদিন এভাবে চলা যাবে জানি না—
চারদিকের জহ্লাদি তাণ্ডবে
এখনও যদি সম্বিৎ না ফেরে—
তাহলে মনুষ্যত্বের অকালমৃত্যু অনিবার্য—

উপেক্ষিতা

সুধা ভট্টাচার্য

অঘ্রাণের এক শীতের রাতে পূর্ববঙ্গের ফরিদপুরের এক অখ্যাত গ্রামে জন্ম হল রানির। সদ্য রক্তমাংসের গন্ধে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এল কুকুরের দল ঘেউ ঘেউ করে। রানির দিদিমার লাঠি তাড়নার ফলে কুকুরের হাত থেকে রক্ষা পেল সদ্যোজাত রানি। এইভাবেই মাঙ্গলিক উলুধ্বনির পরিবর্তে কুকুরের চিৎকার তাকে স্বাগত জানাল। সূচনাই হয়তো সারা জীবনের আভাস দিয়ে গেল।

পর পর দুই কন্যার পরে তৃতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে পিতা-মাতা অবশ্যই আশা করেছিলেন পুত্র সন্তানের। স্বাভাবিক কারণেই তারা রানিকে গ্রহণ করলেন, সমাদরে গ্রহণ করলেন না নিশ্চয়ই। যাইহোক রানির যখন দশ মাস বয়স, তখন রানির বাবা রানিদের নিয়ে এলেন কলকাতায়। রানির বাবা আয় করতেন সামান্যই। তবুও তারই মধ্যে তাদের চলে যাচ্ছিল মোটামুটি।

রানির যখন ছ বছর বয়স তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। হাতিবাগানে পড়ল জাপানি বোমা। রানির বাবা আতঙ্কিত হয়ে আবার সমস্ত পরিবারকে রেখে এলেন পূর্ববঙ্গের সেই গ্রামে, যেখানে রানি জন্মেছিল, অর্থাৎ রানির মামাবাড়িতে।

শিশুকাল থেকেই রানি ছিল প্রকৃতিপ্রেমিক। তাই কলকাতার জাঁকজমক, আলোর রোশনাই প্রভৃতি আকর্ষণীয় বস্তু থেকে বহুদূরে অরণ্য এবং খাল বিলে ঘেরা গণ্ডগ্রামে গিয়েও তার খুব ভাল লাগল, হয়তো বা জন্মভূমির আকর্ষণ এর অন্যতম কারণ। ভর দুপুরে সমস্ত মানুষ যখন নিদ্রামগ্ন ও বিশ্রামরত রানি তখন ঘুঘু ডাকা, ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বেড়াত। কখনও আমগাছের ডালে বসে দোল খেত, কখনও বা তেঁতুল গাছের তলায় বসে তেঁতুল খেত আপন মনে আর প্রাকৃতিক দৃশ্য অনুভব করত অন্তরের সম্পূর্ণ অনুভূতি দিয়ে। কখনও বা ছোট্ট রানি দাদামশাই-র ছেঁড়া জাল নিয়ে সকলের অগোচরে মাছ ধরতে যেত ছোটো খালে বা বিলে। কখনও বা কোনো গাছতলায় সাজিয়ে নিত পুতুল খেলা ও রান্নাবাটি খেলার আসর। এর জন্য তার কোনো সাথী বা সঙ্গীর প্রয়োজন হতো না। সে একাই যেন একসঙ্গে অনেক চরিত্রে অভিনয় করতো।

এমনি করে দিনগুলো কেটে গেলেই হতো ভাল। কিন্তু তা তো হবার নয়। 'সময় এবং স্রোত কারও জন্য অপেক্ষা করে না।' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের হাওয়া বাংলাদেশেও ধাক্কা মারল। অর্থাৎ বাজারে জিনিসপত্রের দামে ঊর্ধ্বগতি, মধ্যবিত্তদের খাবারেও পড়ল টান, সর্বত্রই নেই নেই ভাব।

মানুষের প্রাথমিক চাহিদা হচ্ছে খাদ্য। এই খাবারের অভাবই রানিকে তার কল্পনা ও সুখানুভূতির জগত থেকে সরিয়ে নিয়ে এল বাস্তবের কঠিন ভূমিতে। ছোট্ট ভাই-বোনগুলোর না খেতে পাওয়া শুকনো মুখগুলো দেখে রানি একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা অনুভব করতো। সে ভাবল কলকাতায় বাবার কাছে গেলে তাদের আর খাবার অভাব থাকবে না। কিশোরী রানি বুঝতে পারল না যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব শহর কলকাতাতেই বেশি করে পড়বে, বিশেষ করে নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারগুলোর ওপরে। ওপরতলার এক শ্রেণির মানুষ চিরকালই তাদের সুখে থাকার উপকরণগুলি পেয়ে থাকে অনায়াসে, বিভিন্ন উপায়ে। এই দুর্যোগের দিনেও তাদের পাওয়াতে কোনো ঘাটতি দেখা দিল না।

রানি যখন একান্ত ভাবে তার বাবাকে কামনা করছিল তখন হঠাৎ রানির বাবা এসে হজির হল। আনন্দে রানির প্রাণ লাফিয়ে উঠল। এবার তারা কলকাতায় যাবে। সেখানে তাদের খাবার অভাব থাকবে না। অনভিজ্ঞ রানি বুঝতেই পারল না কলকাতায় কত বড় দারিদ্র ও দুঃখ তাদের জন্য ওঁত পেতে বসে আছে। পূর্ববঙ্গকে বিদায় জানিয়ে রানিরা চলে এল কলকাতায়। রানির জীবনবৃক্ষ থেকে চিরদিনের মত ঝরে গেল সুখের পাতাগুলি।

২.

সালটা ১৯৪৩—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে।

ঝড়ের প্রাক্‌কালে প্রকৃতি যেমন স্তব্ধ হয়ে যায়, কেমন একটা থমথমে ভাব, যেন একটা অজানা আশঙ্কায় সবাই চুপ। গাড়ি, ঘোড়া লোকজনের চলাচল খুবই কম।

গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মানুষকে বেরোতেই হবে। তা না হলে বোধহয় এটুকু সচলতাও থাকত না। এখনকার মহাব্যস্ত সেন্ট্রাল এ্যাভিনিউ দিয়ে একমাত্র মিলিটারি সৈন্য বোঝাই গাড়ি হুস্ হুস্ করে চলে যেত মহাসমারোহে। সমারোহে এজন্য বলছি যে ওদের চোখেমুখে ছিল না কোনো উদ্বেগ বা আতঙ্কের ছায়া, থাকবেই বা কেন? ওরা পররাজ্যের অধীশ্বর।

রানির বাবা সদানন্দ চৌধুরি কলকাতার দর্জিপাড়ায় একখানি ঘর ভাড়া করে ওদের নিয়ে এলেন কলকাতায়। পরের দিন সকালবেলা তিনি রানিকে বললেন, 'চল তো মা আমার সঙ্গে থলে নিয়ে, এখানে খোলা বাজারে চাল পাওয়া যায় না, লাইন দিয়ে মাথা পিছু ১ সের করে চাল পাওয়া যায়। তোকে সঙ্গে নিলে ২ সের চাল পাওয়া যাবে, তাছাড়া রাস্তাটাও তোর চিনে রাখা দরকার।' বাবার কথা শুনে রানি চমকে উঠল। এখানেও কি খাবার অভাব?

ঘরে বাইরে সর্বত্র শুরু হল যুদ্ধ। দেশ রক্ষা ও আক্রমণের যুদ্ধ। রানিদের শুরু হল টিকে থাকার যুদ্ধ। সর্বত্রই শুধু নেই আর নেই। চাল নেই, তেল নেই, কয়লা নেই। এই নেই অবশ্য কতটা বাস্তব কতটা কৃত্রিম সেটা ভাববার বিষয়। তবে রানিরা চিরকালই নেই রাজ্যের অধিবাসী। অনেক থাকলেও শেষ পর্যন্ত এদের কাছে এসে পৌঁছয় না কিছুই।

অবস্থা ক্রমশ জটিলতর হল। এক সের চাল পাবার জন্য একটি ছাড়পত্র জোগাড় করতে আট বৎসর বয়সী রানিকে বাড়ি থেকে বেরোতে হতো ভোর ৪ টায়, ফিরত পরের দিন দশ-বারোটায়। তারপর আর চিন্তা নেই, ঐ ছাড়পত্রের বিনিময়ে নির্দিষ্ট দোকান থেকে যে কোনো সময়ে চাল পাওয়া যাবে, মাত্র এক সের। দেরিতে যাবার জন্য রানির বাবা ও দাদামশাই কোনোদিনই পেতেন না টিকিট। ফলে পুরো দায়িত্বটা রানির ওপর এসেই পড়ল। রাতে সে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে পারত না। যদি না পায় ঐ এক সেরের ছাড়পত্র তবে তার ছোটো ছোটো ভাইবোনেরা ও বাবা-মাও খেতে পাবে না এক মুঠো ভাত। এই অনিশ্চয়তার কারণ ছিল। টিকিটের সংখ্যা ছিল নির্দিষ্ট আর লাইনে মানুষ থাকত অসংখ্য। পেছনের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ ফিরে যেত শূন্য হাতে। ক্রমশ অনিশ্চয়তা বেড়ে যেতে লাগল। রানিরও রাতের ঘুম গেল চলে। কোনো কোনো দিন রানি বেরিয়ে যেত রাত বারোটা-একটায়। এইভাবে চলল পুরো চার বছর। এর মধ্যে কখনও কয়লার লাইনে, কখনও তেলের লাইনে, কখনও বা দোকানে বাজারে। জন্মলগ্নে উপেক্ষিতা রানির কৈশোরটাও কেটে গেল প্রাণচঞ্চল খেলার প্রাঙ্গণের বাইরে রাস্তায় আর ফুটপাতে, সম্পূর্ণ উপেক্ষিতা হয়েই।

ইতিমধ্যে রানি ভর্তি হয়েছিল স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে, নির্দিষ্ট বয়স সীমা পেরিয়ে যাবার পরেই। বাস্তব সমস্যার চাপেই যথাসময়ে সে ভর্তি হতে পারেনি।

১৯৪৭ সাল—এল বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই স্বাধীনতা দিবস, ১৫ আগস্ট। চারিদিকে ধ্বনিত হল সমস্বরে 'জাগে নব ভারতের জনতা, এক জাতি এক প্রাণ একতা'। চারিদিকে শুধু উৎসব আর উৎসব। ২০০ বছরের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত ভারতবাসী আনন্দে উদ্বেলিত হবেই। বাঁধনহারা আনন্দে মেতে উঠেছিল সমস্ত ভারতবর্ষ। কিন্তু হায়, সাধারণ নাগরিকরা সেদিন বুঝতেই পারেনি যে এই স্বাধীনতার ভিত নিতান্তই নড়বড়ে। সুচতুর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বিজাতিতত্ত্বের যে বীজ পুঁতেছিল ভারতবর্ষের মাটিতে সযতনে, তার ভিত্তিতেই সেদিন ভারতবর্ষ ভাগ হয়েছিল 'হিন্দুস্থান' আর 'পাকিস্থান'। মুক্তির আনন্দে দিশাহারা মানুষ সেদিন বুঝতেই পারেনি যে আনন্দে উদ্ভাসিত এই আলোর নিচেই আছে জমাট বাঁধা কালো অন্ধকার, যা একদিন সমস্ত আনন্দকে ম্লান করে দেবে।

আনন্দের রেশ কাটতে না কাটতেই দেখা গেল সেই অশুভ অন্ধকার যা সমস্ত আলোকে ঢেকে ফেলল। শুরু হল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কী ভয়ানক সেই দৃশ্য! কী ভয়ঙ্কর সেই আত্মঘাতী দাঙ্গা। দলে দলে বাংলাদেশ থেকে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুরা চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে লাগল আসামে, পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরা প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যগুলিতে। শুরু হল তাদের অবর্ণনীয় দুঃখের জীবন। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মাথায় নিয়ে বর্তমানে একটুখানি আশ্রয় ও ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য তারা ছুটে বেড়াতে লাগল এধার থেকে ওধার। একদিকে স্বাধীন মাতৃভূমি ত্যাগের দুঃখ ও অপরদিকে অনিশ্চিত জীবনের আতঙ্ক এদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল।

রানির বয়স তখন মাত্র ১২ বছর, কিন্তু বাস্তব সংঘাতের পথ ধরে এগোতে হয়েছে বলেই বোধহয় তার বোধশক্তি এবং ধী-শক্তি বয়সের সীমা পেরিয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সে দেখেছে, দুটো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখেছে, দেখেছে স্বাধীনতার উৎসব।

স্বাধীনতা উৎসবের গানের সঙ্গে সেও গলা মিলিয়েছে। আনন্দে তার হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছে। তার ধারণা এখন থেকে আর কারুর কোনো অভাব থাকবে না, সবাই খেয়ে পরে সুখে থাকবে। হায়! সে কী করে বুঝবে যে নিষ্ঠুর বিদেশি শাসকদের চাইতে স্বদেশি শাসকরা হবে আরও বেশি নির্মম আরও বেশি স্বার্থপর, ধনী হবে আরও ধনী, গরিব হবে আরও গরিব।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাও তাকে গভীর আঘাত করেছিল। সে ভেবেছে, কেন এই দাঙ্গা? কেন মানুষ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে পশুতে পরিণত হয় এবং পশুর মতোই অপর মানুষকে খুন করে উল্লাস করে? সাময়িকভাবে রানিও বিরক্ত হয়েছে মুসলমানদের ওপর। তার ছোট্ট বুদ্ধিতে সে বুঝেছে যে মুসলমানদের অত্যাচারের ফলেই লক্ষ লক্ষ বাঙালি চলে আসতে বাধ্য হয়েছে ওপার বাংলা ছেড়ে এপার বাংলায়। ছিঁড়ে গেছে তাদের নাড়ির টান। সেই সঙ্গে রানিদেরও পিতৃ-পিতামহের ভিটেমাটি ও বাড়ি সবই চলে গেল চিরকালের মতো।

একটু বেশি বয়সে স্কুলে ভর্তি হলেও রানি কিন্তু বছরের প্রতিটি পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার করে শিক্ষিকাদের ভালোবাসা অর্জন করল। তার সংকল্প, পড়াশুনা করে বড় হবে, চাকরি করবে, ভাইবোনেদের মানুষ করবে ইত্যাদি। এছাড়া রানির মধ্যে ছিল অদম্য উৎসাহ। সে সব কিছু জানতে চায়, বুঝতে চায়, এবং করতে চায়। কিন্তু তার এই করতে চাওয়ার পথে ছিল প্রচণ্ড বাধা। সে বাধা দারিদ্রের। পিতা সদানন্দ চৌধুরি যে সামান্য মাইনের চাকরি করতেন, তা দিয়ে সংসারের প্রাথমিক চাহিদা খাদ্য সংগ্রহ করাই দায় হতো। তাই কিছু শেখা বা করার আকাঙ্ক্ষা রানির অন্তরেই থেকে গেল।

সব সমস্যার দায় রানিকেই সামলাতে হয়। রেশন আনা, বাজার-দোকান করা, কয়লা-ঘুঁটে জোগাড় করা পর্যন্ত।

এই ভাবেই দিন কেটে যেতে থাকে। রানি কৈশোর থেকে যৌবনে পা দেয়। নানান সমস্যা ও কাজের চাপে রানি বুঝতেই পারেনি যে সে বড় হয়েছে। তার মা তাকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেন যে সে বড় হয়েছে, এখন আর বেশি বাইরে যাওয়া উচিত নয়। রানির বাবা কিন্তু ঠিক করেছিলেন মেয়ে পড়াশুনায় ভাল, অতএব তিনি মেয়েকে কষ্ট করে হলেও পড়াবেন, যাতে সে অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। বাবার এই ইচ্ছাই রানিকে

প্রচণ্ড আনন্দ এবং উৎসাহ দিত। হাজার কাজের মধ্যেও সে রাত জেগে পড়াশুনা করত এবং তার ফলও পেত। অর্থাৎ সপ্তম শ্রেণি পর্যন্ত রানি প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্থানে যায় নি।

কিন্তু পঞ্চাশোর্ধ্ব সদানন্দ চৌধুরির হঠাৎ মনে হল তিনি বেশি দিন বাঁচবেন না। অল্প আয়ুর বংশ তাদের। অনূঢ়া কন্যাটিকে বিয়ে দিতে পারলে তিনি খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। এই মানসিক পরিপ্রেক্ষিতে আগুনে ঘি ঢাললেন তাঁর এক নিকট আত্মীয়া। তাঁর প্রস্তাবিত পাত্রটি রূপে গুণে ভালোই। টাকা পয়সাও নাকি প্রচুর। সর্বোপরি পাত্রপক্ষের চাহিদা বা দাবি কোনটাই নেই, অতএব মানসিকভাবে উদারও বটে। সুতরাং দরিদ্র সদানন্দ চৌধুরি দু-টি কারণে বিয়ের প্রস্তাবে রাজি হয়ে মানসিক ভাবে অনেকখানি এগিয়ে গেলেন। প্রথমত বিয়েতে কোনো যৌতুক দিতে হবে না। দ্বিতীয়ত তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁরই সন্তান-সন্ততিদের ভালোভাবে খেয়ে-পরে বেঁচে বর্তে থাকার দায়িত্ব নিতে পারবে তাঁর বিত্তশালী মেয়ে-জামাই। এরকমই বুঝিয়েছিলেন পরম হিতৈষিণী সেই আত্মীয়া।

কোনো বুদ্ধিমান মানুষের যদি হিসেবের ভুলে একবার বিচ্যুতি ঘটে তবে সেখান থেকে আর তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। কারণ ঐ বিচ্যুতি-ই তার কাছে অভ্রান্ত সত্য বলে মনে হয়। নিজের থেকে ভুল যখন ভাঙে তখন ক্ষতি যা হবার তা অনেকখানিই হয়ে যায়।

বুদ্ধিমান সদানন্দ চৌধুরি ভাবলেন এই ব্যাপারে মেয়ের মতটা একবার নেওয়া দরকার যাতে ভবিষ্যতে কোনো অভিযোগের মুখে না পড়তে হয়। এই অংশ পিতা-কন্যার মুখের কথাতেই বলি।

পিতা : বিয়ের ব্যাপারে শুনেছ তো সব। তোমার এই বিয়েতে পুরোপুরি সায় আছে তো?

কন্যা : তুমি তো জান বাবা তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। তোমার অমতে তো আমি জীবনে কোনো কাজই করিনি। এ ব্যাপারেই বা আমার মত চাইছ কেন?

এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলেন না রানির বাবা। তিনি স্পষ্ট স্বীকারোক্তি চান রানির। তিনি বললেন : আজকাল যুগের বদল হচ্ছে, পিতা-মাতার মতই সব নয়। পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব মত জানাবার অধিকার আছে। সুতরাং তোমার কোনো আপত্তি থাকলে বল।

এইবার রানি দৃঢ় কণ্ঠে বলল : আমার মত যদি একান্ত নিতেই হয় তবে বলি এই বিয়েতে আমার মত নেই। কারণ? আমি যে বিষয়গুলি অপছন্দ করি তার সব কটিই তথাকথিত ঐ ভদ্রলোকটির মধ্যে রয়েছে।

রানি লক্ষ করল তার উত্তর শুনে বাবা যেন একটু রুষ্ট হলেন। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন—বিয়েটাই তা হলে তোমার জীবনে অনিশ্চিত হয়ে যাবে। কারণ এমন সুযোগ জীবনে বার বার আসে না। এখানে বিয়ে হলে আমার টাকা-পয়সারও প্রয়োজন হবে না।

রানি মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর এবং স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল : আমি এই বিয়েতে রাজি আছি বাবা।

মনে মনে ভাবল রানি, একটা সাধারণ মেয়ের জীবন বই তো নয়! তা যদি নষ্ট হয়ে যায় তো যাক না। তবু তার পিতা মুক্ত হোক কন্যাদায় থেকে, নিশ্চিন্ত হোন অন্যান্য সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার কথা ভেবে। জীবনবোধে অনভিজ্ঞ রানি সেদিন বুঝতে পারেনি যে একটা জীবনের কত মূল্য। সুস্থ মানসিকতার একটা জীবন কত কিছু সৃষ্টি করতে পারে, পারে দেশের ও দশের উপকার করতে। একটা সুন্দর সংসার গড়ে তুলে পারে তার যোগ্য উত্তরসূরি তৈরি করতে।

ফাল্গুনের এক নির্দিষ্ট দিনে রাতের শেষ প্রহরে যৌতুকহীন, কোলাহলহীন, আভরণহীন রানির বিয়ে হয়ে গেল। লগ্ন সময়টা বোধ হয় রানির প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাকে লজ্জার হাত থেকে খানিকটা বাঁচিয়েছিল। রাতের অন্তিম প্রহর, বিশ্বচরাচর সুপ্তিতে মগ্ন। হ্যারিকেনের এবং জোনাকির আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। মাঝে মাঝে শিয়ালের হুক্কাহুয়া ধ্বনি এবং একটানা ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক বোধহয় সানাইয়ের অভাব পূর্ণ করছিল। বিয়ে তো!

যৌবনের সব আশা আকাঙ্ক্ষা রানির চুরমার হয়ে গেল। সে লেখাপড়া শিখে বড় হবে, চাকরি করবে, আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকবে এবং বাঁচাবে তার ভাই-বোনদের, এ সব—সবই শেষ হয়ে গেল। অজানা ভবিষ্যতের একটা ইঙ্গিত ইতিমধ্যে রানি যেন উপলব্ধি করতে পেরেছিল। নিরুচ্চারিত একটা কান্না যেন তার বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইল। বুকের ভেতর একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। কিন্তু কিছুই প্রকাশ করল না। অনুষ্ঠান শেষে একটা সময়ে রানি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। একলা ঘরের কোণে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। পিতার প্রতি তার দারুন অভিমান অশ্রু হয়ে ঝরে পড়তে লাগল। যে পিতাকে সে দেবতার মতো ভক্তি করতো, যাঁর সমস্ত রকম কষ্ট লাঘবের জন্য রানির মন সর্বদাই উন্মুখ হয়ে থাকত, সঙ্গ দিত তাঁর সমস্ত রকম কাজে, বিশ্বাস এবং আন্তরিক ভালোবাসাও পেয়েছে যাঁর কাছ থেকে, সেই পিতাই তাঁর আদরের কন্যার মানসিক দিকটা একবার দেখলেন না? খোঁজ পর্যন্ত করলেন না পাত্রপক্ষ সম্পর্কে? শোনা কথার সত্যতা সম্পর্কে? বুদ্ধিমান সদানন্দ চৌধুরি কেন এমন ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেকে এবং প্রিয় সন্তানকে ঠকালেন তা বোঝা দুষ্কর। তবে কি দারিদ্রই এর অন্যতম কারণ? হয়তো তাই-ই। দারিদ্র হচ্ছে মহাপাপ, অভিশাপ।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত 'নিয়তি কেন বাধ্যতে' এই শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করে নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে রানি পতিগৃহে যাত্রা করল। কৈশোরে উপেক্ষিতা রানি যৌবনেও হল সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিতা।

৩.

এক বুক অভিমান এবং যন্ত্রণা নিয়ে রানি শ্বশুরবাড়ি গেল। মনে ভয়, পারবে তো সবার মন জয় করতে? মনে মনে বলে, নিশ্চয় পারবে। নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিতে সে জানে।

যথাসময়ে গাড়ি গেটের সামনে পৌঁছল। বধূবরণ! মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত রানি বধূবরণের আয়োজন এবং উপকরণ দেখে মনে মনে খানিকটা স্বস্তি বোধ করল। ভাবল এটাই ঠিক হয়েছে, এর বেশি কিছু হলে তার নিজেরই লজ্জা করত। মনে মনে হেসে সে বলে, 'যোগ্যাৎ যোগ্যেন যোজয়েত্'। বাহ্যিক অবস্থার দিক থেকে দুই পরিবারে যথেষ্ট মিল আছে। অর্থাৎ যে আর্থিক অসচ্ছলতার সঙ্গে রানি আবাল্য পরিচিত তা এখানেও বিদ্যমান। ভালোই হলো, অসুবিধা হবে না।

শ্বশুরবাড়ির প্রথম রাত বিচ্ছেদ-বেদনা, অজানা আশঙ্কা, ক্লান্তি ও অবসাদের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। দ্বিতীয় দিন, নতুন বৌয়ের রান্না খাবে বলে রানিকেই সব রান্না করতে হল। কৈ-মাছের ঝোল, মুসুর ডাল ইত্যাদি। খাবার শেষে নতুন বৌয়ের রান্নার প্রশংসা শুনে রানির ভালোই লাগল।

এল রাত। সে ভুলেই গিয়েছিল যে বিবাহিত জীবনে আজকের দিন এক বিশেষ দিন। মধুরাত! দোষ নেই রানির। প্রথমত, মানসিক দিক থেকে সে তৈরিই ছিল না এই বিশেষ দিনটির জন্যে। দ্বিতীয়ত, উৎসবের কোনো লক্ষণই সেখানে উপস্থিত ছিল না।

রাত বারোটায় রানির স্বামী বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়ার পাট সারলেন। রানির বড় জা একটি ঘর দেখিয়ে বললেন ওটাই তাদের শোবার ঘর। অর্থাৎ ফুলশয্যার ঘর।

ঘরটিকে ঘর না বলে প্রকোষ্ঠ বলাই শ্রেয়। দুজন লোক পাশাপাশি শোওয়া কষ্টসাধ্য ব্যাপার। ঘরের একটিই মাত্র দরজা, জানালা একটিও নেই। এককোণে একটি স্থায়ী উনুন। দিনে সেখানে রান্না হয়। সেদিকের দেয়ালটা ঘন ঝুলে আবৃত। পাশের দেওয়ালে শরীরের ঘষা লাগতেই ঝুর ঝুর করে বালি পড়ল বিছানায়। মাথার দিকে কাঠ ও ঘুঁটের বস্তা, শিশি-বোতল, কৌটো ইত্যাদি ... শয্যা? রানির বাবার দেওয়া অনিবার্য দানের একটি মাত্র পাটি ও ঢাকনাবিহীন বহু ব্যবহারে জীর্ণ দুটি বালিশ। ঘরের অন্যান্য আসবাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রচুর ধূম উদ্‌গীরণকারী একটি লম্ফ ঘরের এক কোণে জ্বলছিল। রানির স্বামী রাতের পোষাক হিসেবে একটি লুঙ্গি পরিধান করে তথাকথিত ঘরটিতে ঢুকে একটি বিল বই জাতীয় বইতে হিসাব লিখতে শুরু করলেন। একটা অজানা আশঙ্কা এবং ভয়ে বিহ্বল রানি কাষ্ঠবৎ এক কোণে বসেছিল। হঠাৎ বজ্রনির্ঘোষ কণ্ঠে ধ্বনিত হল, 'পা-টা টিপে দাও।' একটা কাজ পেয়ে রানি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সে নিষ্ঠার সঙ্গে পা টিপতে লাগল। এক সময় লম্ফটি নিভল। মধুরাতে স্বামীর সঙ্গে তার কোনো বাক্য বিনিময় হল না। শারীরিক কিছু বিব্রত বোধ করার পরই রানি শুনতে পেল নাসিকা গর্জন। বুঝল তার স্বামী গভীর নিদ্রায় মগ্ন। নিদ্রাহীন রানি দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে থাকল বাকি রাত। সঙ্গ পেয়েছিল কিছু আরশোলা ও ইঁদুরের। রাতে নিরুপদ্রবে ঘুরে বেড়ানোয় অভ্যস্ত কিছু আরশোলা ও ইঁদুর স্ব স্ব শব্দে এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করতে লাগল।

শুরু হয় রানির সাংসারিক জীবনযাত্রা। লঘু-গুরু মিলিয়ে সংসারের সদস্য সংখ্যা ১৫ জন। রানি ছোটো বউ। তাই বোধ হয় গুরু দায়িত্বটা তার কাঁধেই পড়ল। ভোর পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করে সেই ঘরেই উনুনে আগুন দিয়ে শুরু করে রান্না। তারপরে নিরবচ্ছিন্ন একটার পর একটা কাজ। অবসর পায় রাত বারোটায়। যেন 'চোখ-বাঁধা কলুর বলদ'। মুখে সে কোনো কথা বলে না, চোখ এবং কানকে খানিকটা নিষ্ক্রিয় করে রেখে কাজ করে যায় আর সমস্ত উপলব্ধি দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে এই সংসারের প্রতিটি চরিত্রকে, খুশি করতে চায় সবাইকে, যে যেমন পছন্দ করে তেমন ব্যবহার দিয়ে। কিন্তু হায়! সেখানেও সে যেন ব্যর্থ হতে থাকে। কাউকেই যেন সে খুশি করতে পারে না। কিন্তু কেন? এরা কী চায়? তবে কি রানির বিয়েতে তার বাবা কিছু দিতে পারেন নি বলেই এদের মনে ক্ষোভ আছে? হয়তো তাই-ই।

কিন্তু রানির স্বামী! যিনি রানিদের দারিদ্রের কথা জেনেও উদার চিত্তের পরিচয় দিয়ে রানিকে বিয়ে করে এনেছিলেন? মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে যিনি রানির খাওয়া-পরার, মান-সম্মান রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন? সংসারের অন্যান্য সকলে তার প্রতি অবিচার করলেও রানির আশা ছিল স্বামী অবশ্যই তার প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি হয়তো তাঁর অন্তরের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে রানির সব অভাব ও দুঃখের ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে তাকে কিছুটা শান্তি দেবেন। কিন্তু অচিরেই রানি বুঝতে পারল প্রেম নামক বস্তুটি তার স্বামীর হৃদয়ে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। শুধু তাই-ই নয়, দয়া, মায়া, করুণা, নিছক কর্তব্যবোধেরও প্রচণ্ড অভাব ভদ্রলোকের। তাহলে! তাহলে ভদ্রলোক কেন রানিকে বিয়ে করে তাকে এই অকরুণ পরিস্থিতির মধ্যে ফেললেন? রানির মনে কেবলই এই প্রশ্ন খোঁচা মারতে লাগল। ক্রমে উত্তরও পেয়ে গেল নিজের মনেই। রানিদের দারিদ্র এবং তার যৌবনই এর জন্য দায়ী। দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে স্বাস্থ্যবতী রানির দেহটাকে পেতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। পেয়েও গেলেন অনায়াসে। দ্বিধাহীন ভাবে রানি যখন একথা বুঝতে পারল তখন লজ্জায়, অপমানে, যন্ত্রণায় কুঁকড়ে গেল সে। আর কোনো শক্তিই যেন তার অবশিষ্ট রইল না।

দিন যায় মাস যায়। বছরও শেষ হয়ে যায়। নতুন বছর আসে প্রত্যাশা নিয়ে। কিন্তু রানির জীবনে আশা-প্রত্যাশা বলে যেন কিছু নেই। যন্ত্রের মতন সে কেবল কাজ করে যায় সূর্যোদয় থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আর নীরবে চোখের জল মোছে সবার অলক্ষ্যে। যেন এক তপ্ত মরুভূমির ওপর দিয়ে রানি চলেছে। সেখানে নেই জল, নেই ছায়া, নেই কোনো সবুজের ইসারা। কেবল উত্তপ্ত বালিরাশি বাতাসকেও সাথী করে ছুটে বেড়াচ্ছে এধার থেকে ওধার। তৃষ্ণার্ত রানি জলের আশায় ছুটে যায় দূরে জলাশয়ের কাছে। কাছে গিয়ে দেখে, ভুল দেখেছে সে, বালির ওপর সূর্যের আলো পরে চিক্‌চিক্ করছে। মনে হয় জল, কিন্তু সে যে মরীচিকা। বঞ্চিত হয় রানি।

অসহায় ও অপরিপক্ক রানি বিয়ের মাত্র এক বছরের মাথায় 'মা' হল। মাতৃত্বের অনুভূতি তাকে কিছুটা আশ্বস্ত করল। জলে ডুবন্ত অসহায় মানুষ কাষ্ঠখণ্ডকে যেমন করে আঁকড়ে ধরে, রানিও তেমনি করে তার সদ্যোজাত শিশুকন্যাকে অবশিষ্ট শক্তিটুকু দিয়ে আঁকড়ে ধরল। ভাবলো এবার বোধ হয় সে এগোতে পারবে। কারণ সন্তানই দিতে পারে পিতা-মাতাকে বাড়তি মানসিক শক্তি। কিন্তু রানির ভাগ্যের হাওয়া যে সর্বদাই প্রতিকূলবাহী। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তার প্রতি অবিচারের মাত্রা এতটুকুও কমল না। উপরন্তু কন্যাকে উপলক্ষ করে অত্যাচারের রূপ পেল অন্য মাত্রা।

এদিকে সংসারে প্রচণ্ড অভাব। দিন আনা-দিন খাওয়া অবস্থায় দিন কাটতে লাগল। ক্রমে অবস্থা এমন হল যে সকলকে খাইয়ে রানির অর্ধাহারে অনাহারে দিন কাটতে লাগল। শরীর ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে লাগল। বুকের দুধ পেল না তার সদ্যোজাত শিশুসন্তান। সহ্য এবং প্রতিরোধের শক্তিকে আর যেন সে ধরে রাখতে পারে না। ক্রমশ সহ্যের বাঁধ সম্পূর্ণ ভেঙে যায়। তাই সে শেষ পর্যন্ত আত্ম-হননের সিদ্ধান্ত নেয়।

রাত ২ টো, শিশু কন্যাকে শেষবারের মতন বুকের দুধ খাইয়ে শুইয়ে দেয় বিছানায়। আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় ছাদের প্রাচীরের কাছে। তিনতলা বাড়ির ছাদ। একবার লাফ দিলেই একেবারে রাস্তায়। মৃত্যু নিশ্চিত। কার্নিসে এক পা তুলতেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে কন্যার নিদ্রিত মুখ। বুকের মধ্যে হাহাকার করে ওঠে। লাফ দিয়ে নেমে আসে নিচে। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে ঘুমন্ত শিশুকে। চুমু খায় এ গালে ও-গালে বারে বারে। মনে মনে বলে, কী পাপ করেছে এই শিশু? এর তো কোনো অপরাধ নেই! তবে কেন সে একে মাতৃহীন, অনাত্ম-অজ্ঞাত বিশ্বে ফেলে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিল? কেন? কেন? ... সে যে 'মা' একথা কেন সে ভুলে গেল? মনে মনে সে নিজেকে স্বার্থপর ও পলায়নপর বলে তিরস্কার করল বারে বারে।

৪.

কন্যাকে সৎপাত্রস্থ করে পিতা-মাতা আনন্দিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। রানির পিতা-মাতাও প্রথম প্রথম সেই আনন্দ পেয়েছিলেন। কারণ রানি ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দেয়নি তার অসুখের কথা বা দুঃখের কথা। মা-বাবার প্রশ্নের উত্তরে সে বলত সুখেই আছে, সংসারের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়ায় তাকে একটু বেশি পরিশ্রম করতে হয়, এইমাত্র। শরীর ক্ষীণ হওয়ার এটাই একমাত্র

কারণ। রানির চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে সে নিজে যতই দুঃখ বা যন্ত্রণা পাক না কেন তা দ্বারা অন্য কাউকে সে প্রভাবিত করত না। কারণ প্রথমত এতে প্রিয়জনকে দুঃখ দিতে হয়। দ্বিতীয়ত, সুহৃদয় ব্যক্তিকে মনের দুঃখ বলায় সাময়িক ভাবে কিছুটা হাল্কা বোধ করলেও দুঃখের প্রকৃত তাৎপর্যই এতে ক্ষুণ্ণ হয়ে যায়। প্রকৃত দুঃখই তো মানুষের প্রকৃত বোধ ও উপলব্ধিকে বাড়াতে সাহায্য করে। দুঃখের আলোকেই মানুষ জীবনের প্রকৃত পথকে চিনে নিতে পারে। রানি তাই তার সমস্ত দুঃখ ও যন্ত্রণাকে মূল্যবান সম্পদের মতো মনের মণিকোঠায় সযত্নে রেখে দেয়। আর তারই আলোয় খুঁজতে থাকে পথ।

একটা সুবিধা ছিল এই যে রানিকে মা-বাবা, ভাই-বোনের সম্মুখীন বেশি হতে হতো না। কারণ বাপের বাড়ি যাওয়া ছিল নিষেধ। সম্ভবত প্রকৃত অবস্থাটা যাতে জানাজানি না হয়, তার জন্যই। বুদ্ধিমান সদানন্দ চৌধুরি রানির মনের গভীর যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করতে না পারলেও তাঁর ধনবান জামাতা যে প্রকৃতপক্ষে ধনশূন্য সেটা বুঝতে পারলেন। খানিকটা সান্ত্বনার স্বরে তিনি মেয়েকে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে এই অবস্থা সাময়িক, ছেলেটি প্রতিভাবান! একদিন সে অনেক টাকা রোজগার করবে। রানি মনে মনে হাসে। বাস্তবিক পক্ষে পিতা-মাতা ভাই-বোনকে সে বোঝাতে চায় যে সে প্রকৃতই সুখী কারণ সে সবাইকে ভালোবাসে।

সময় তার আপন নিয়ম অনুযায়ী গড়িয়ে চলে সামনের দিকে। রানিও তার মন্দ ভাগ্যকে সঙ্গী করে শ্রান্ত, ক্লান্ত দেহে চলতে থাকে দৃষ্টিকে দূরে প্রসারিত করে। পথের শেষ কোথায় ...?

ইতিমধ্যে রানির স্বামীর দাদা মারা গেছেন চার সন্তানসহ স্ত্রীকে রেখে। তীক্ষ্ণ বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্না রানি বুঝতে পারে কোনো রকমেই এই ভার বহনের ক্ষমতা তার স্বামীর নেই। রানির মনে হয় যেন তার ঘাড়েই চেপেছে দায়িত্ব।

শিশু বয়স থেকেই রানি সমস্ত রকম দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এসেছে। কিন্তু এখানে সে কী করবে? তার যে কোনোই স্বাধীনতা নেই। সে এখানে সম্পূর্ণ বন্দি। না আছে বাইরে যাওয়ার স্বাধীনতা, না আছে কোনো কাজ করবার স্বাধীনতা। এমনকি কথা বলার স্বাধীনতা পর্যন্ত তার নেই। তবে কেমন করে এই ডুবন্তপ্রায় সংসার নামক জাহাজটিকে সে টেনে তুলবে ডাঙায়?

অনেক ভেবে চিন্তে বুকে সাহস সঞ্চয় করে সে তার স্বামীকে বলে যে, এই কঠিন সময়ে সে তার স্বামীকে সাহায্য করতে চায়। কী সাহায্য? ঘরে বসে যে কোনো ধরনের কাজ করে অর্থ আয়ে সাহায্য। আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সমস্ত রকম কাজ করাকেই সে শ্রদ্ধা করতো। সে কাজ যত ছোটোই হোক না কেন? বিয়ের আগে বাবার বাড়িতে সে দু-পয়সার বিনিময়ে ১ কেজি সুপারি কেটেছে, ঠোঙা বানিয়েছে এবং তার দ্বারা ছোটো ভাই-বোনেদের ছোটো ছোটো প্রয়োজন মেটাবার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু হায়! কোনো প্রস্তাবেই সে তার স্বামীর কাছ থেকে কোনো সাড়া পায় না। নিষ্ফল আক্রোশে তার ইচ্ছেগুলো দেওয়ালে মাথা কুটে মরে। মনে মনে ভাবে সে, দেবার উদারতা যাদের নেই নেবার মতো ঔদার্যই বা তারা পাবে কেমন করে?

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, অনেক চোখের জলের বিনিময়ে-ও যে রানিকে সারা বছরে যেতে দেওয়া হতো না তার বাবার বাড়িতে, অবশেষে তাকে স্বেচ্ছায় সেখানে রেখে এল তার স্বামী। ক-এক মাস বাদেই সে নিজেও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে শুরু করলো।

বাবার বাড়ি এসে রানির যন্ত্রণা আরও বেড়ে গেল। মিথ্যার প্রলেপ দিয়ে যে সত্যটাকে সে চাপা দিয়ে রেখেছিল, সেই প্রলেপ উঠে গিয়ে সত্যটা ক্রমশ প্রকাশ পেতে শুরু করল। রানির বাবা মনে মনে বুঝলেন তার আদরের মেয়েকে তিনি ঠকিয়েছেন সব দিক থেকে। তার বিষণ্ণ মুখ ও অপরাধী চোখের দিকে তাকিয়ে রানি সেটা বুঝতে পারত। ফলে রানির যন্ত্রণা বেড়ে যায় অনেক গুণ। সর্বক্ষণই সে ভাবে কেমন করে সে তার পিতাকে এই অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি দেবে।

প্রথম প্রথম সে চেষ্টা করেছে স্বামীকে বাস্তব বোধে উন্নীত করতে, যাতে সে স্বনির্ভর হয়ে এখান থেকে চলে যেতে পারে। কিন্তু কোনো যুক্তি, বুদ্ধি, অনুরোধ, উপরোধ কিছুই তাকে স্পর্শ করে না। ... সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় রানি। হতাশ মনে সে ভাবে, মানুষ তো প্রাণিজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ চেতন প্রাণি। কোনো চেতনাই যার মনে সাড়া জাগায় না সে কোনো শ্রেণির মানুষ?

যথার্থ পুরুষকার হচ্ছে প্রেম, ত্যাগ, ক্ষমা, তিতিক্ষা প্রভৃতি গুণের সমন্বয়। এই গুণগুলি যে পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান সেই-ই যথার্থ পুরুষ। অন্যথায় সে লিঙ্গ ধারক মাত্র।

পৌরুষত্বহীন স্বামীর আস্ফালন সহ্য করতে করতে সে ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সে অনেক ভেবে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, মান-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখে চলতে হলে এবং তার সন্তানদের খাইয়ে পরিয়ে বড় করতে হলে এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা দিতে হলে তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হতে হবে। কিন্তু কোন পথে? কেমন করে?

স্বামীর প্রবল বাধা ও নিষেধকে উপেক্ষা করে সে শুরু করল পড়াশুনা। শিশুকাল থেকেই পড়াশুনার প্রতি রানির আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তাই এই পথটাকেই সে বেছে নিল। লক্ষ্য? সে অন্তত পক্ষে গ্র্যাজুয়েট হবে, চাকরি করবে এবং সন্তানদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মিটিয়ে তাদের সুন্দর করে গড়ে তুলবে।

৫.

শুরু হল রানির সাধনা ও তপস্যা। ৮ বছর আগে বন্ধ করে রাখা বই-খাতার ধুলো ঝেড়ে শুরু করে লেখা-পড়া, তবে অবশ্যই গোপনে। সে কারুকেই বুঝতে দিতে চায় না যে সে কিছু একটা করতে চাইছে। কারণ যদি সে তার লক্ষ্যে উত্তীর্ণ হতে না পারে, তা হলে সবার কাছে হাস্যাস্পদ হতে হবে। তাই এই কাজে রাতকেই তার সাহায্যকারী সঙ্গী হিসাবে বেছে নেয়। বিশ্বচরাচর যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন, তখন রানি শুরু করে অধ্যয়ন। ভোরের আলো ফোটার আগে বইপত্র গুছিয়ে রেখে শুয়ে পড়ে বিছানায় যেন সেও ঘুমিয়েছিল সবার সাথে নিশ্চিন্তে।

একদিন সে ধরা পড়ে যায় বাবার কাছে। সদানন্দ চৌধুরি লক্ষ করেছেন, রাত জেগে তার মেয়ে লেখা-পড়া করে। তিনি প্রশ্ন করে জানতে চান মেয়ের উদ্দেশ্য। রানি তার সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে পিতার কাছে। মেয়ের কথা শুনে মুহূর্তে সদানন্দ চৌধুরির চোখ দুটো চিক্‌চিক্ করে ওঠে। ঠোঁটের কোনে ফুটে ওঠে হাসি। সেটা লক্ষ করে রানি বুঝতে পারে যে তার অনুমান সত্য।

মেয়ের দুর্ভাগ্যের জন্য নিজেকে দায়ী করে মনে মনে প্রচণ্ড অনুতপ্ত ছিলেন তিনি, কিন্তু অপরাধ বোধ থেকে মুক্তি পাবার কোনো রাস্তাই তিনি খুঁজে পাচ্ছিলেন না। মেয়েই সেই রাস্তা বাতলে দিল দেখে তিনি সকৃতজ্ঞ ও অশ্রুসিক্ত নয়নে মেয়ের দিকে তাকালেন এবং আবেগ জড়িত কণ্ঠে মেয়েকে বললেন সে নিশ্চয়ই পারবে সাফল্য লাভ করতে। কারণ সে একদা ভাল ছাত্রী ছিল। পিতা রানিকে স্কুলে ভর্তি হতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু রানি ভর্তি হতে চায়

না। কারণ একাধিক। প্রথমত ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়ে ভাই-বোন, দ্বিতীয়ত প্রচণ্ড আর্থিক অনটন, তৃতীয়ত লোকলজ্জা প্রভৃতি। সে বলে সে ঘরে বসেই পারবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে। ঘরে বসে পড়তে গিয়ে পাছে এই উদ্যোগ স্তিমিত হয়ে যায় এই আশঙ্কায় তিনি মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। রানিও পিতা-মাতার ঐকান্তিক আশীর্বাদকে সম্বল করে ঝাঁপিয়ে পড়ল জীবন যুদ্ধে। 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।'

মনীষীদের আপ্তবাক্য 'ভাল কাজে বিঘ্ন অনেক', এ কথা যে এত সত্য এ কথা রানি এতদিন বুঝতে পারেনি। জীবনে চলার পথ সবসময়ে ফুল বিছানো হয় না সত্যি, কিন্তু এত যে অসংখ্য কাঁটা থাকে তাও তার অজানা ছিল। ঘরে বাইরে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে থাকল রানি।

প্রথম দিকে তার স্বামী তাকে নিরস্ত করতে চাইল এই বলে যে এখন পড়াশুনা করে কী হবে? এখন নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে বি.এ. পাশ করে চাকরি করা তার পক্ষে অসম্ভব। রানি উত্তরে বলে, 'ক্ষতি তো কিছু নেই! চেষ্টা করতে আপত্তি কোথায়?' মনে মনে রানি তার সংকল্পে অটল থাকে। এরপর তার স্বামী বিভিন্ন পদ্ধতিতে তার ওপর মানসিক অত্যাচার শুরু করে। বিনা কারণে ছুতোয় নাতায় চিৎকার, চেঁচামেচি, খাবার না খাওয়া ও সর্বোপরি চরিত্রের প্রতি কটাক্ষপাত। এইভাবে বহু সময় সে রানির নষ্ট করেছে কিন্তু তার পথ থেকে তাকে সরাতে পারে নি।

রানির ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলে কথিত ব্যক্তিরাও দেখা গেল তার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠল, কিন্তু কেন? কেউ তো কখনো তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় নি!

একমাত্র তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন এবং এক পিসেমশাই তাকে উৎসাহ দিয়েছেন। আগের দিনের গ্র্যাজুয়েট, বৃদ্ধ এই পিসেমশাই-এর কাছেই রানি অঙ্ক, ইংরাজি ও সংস্কৃত পড়ত। তিনি অত্যন্ত আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে রানিকে বোঝাতেন এবং আশীর্বাদ করতেন যেন সে সাফল্য লাভ করে। এটাই রানির কাছে অনেক মনে হতো। বাকি সমস্ত দুনিয়া যেন তার বিরুদ্ধে লেগেছিল। যেন পড়াশুনা করে বাঁচতে চাওয়া তার পক্ষে এক বিরাট অপরাধ। রানি এ সব কিছুকেই তুচ্ছ করে এগিয়ে চলে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কণ্টক ক্ষুদ্র হইলেও তার বিদ্ধ করিবার ক্ষমতা আছে।' রানি প্রচণ্ড শক্তিতে নিন্দা-সমালোচনাকে তুচ্ছ করে চললেও মাঝে মাঝে সেও এই কাঁটার আঘাতে যন্ত্রণাক্ত হয়ে মুষড়ে পড়ত। রক্তঝরা হৃদয়ে সে ভাবত মানুষ কেন এমন হয়? মানুষ তো মানুষেরই জন্য? অন্যের উপকার করা হয়তো সবার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না, যদিও উপকার করাই মানুষের ধর্ম হওয়া উচিত। একটু সহানুভূতি, একটু সহৃদয়তা পেলে কত নির্জীব, নিস্তেজ প্রাণ জীবনের স্বাদ খুঁজে পায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় এক শ্রেণির মানুষ অন্যের উপকার করার জন্য অত্যন্ত সক্রিয়। পৃথিবীর তামাম মানুষের মন থেকে যদি উপকার করার বৃত্তিটা বিতাড়িত হতো তবে আজকের পৃথিবীর চেহারাটা এত অসুন্দর হতো না।

যন্ত্রণাক্ত রানি নিজেকে ধাক্কা মেরে জাগিয়ে তোলে, এতো ভাবার অবসর তার নেই। অল্প সময়ে তাকে গন্তব্য স্থলে পৌঁছতে হবে।

দীর্ঘ ৮ বছরে অনলস পরিশ্রম করে, সাফল্যের এক এক ধাপ পেরিয়ে, সে পৌঁছে যায় তার উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে। সে বি.এ., বি.টি. পাশ করে। আনন্দে উৎফুল্ল সদানন্দ চৌধুরি যেন সমস্ত অপরাধবোধ থেকে মুক্তি পেলেন। আনন্দের আতিশয্যে তিনি মেয়েকে বলেই ফেললেন, 'ওটা না ঘটলে তো এটা হতো না!' ম্লান হেসে রানি পিতার কথায় সায় দেয়। মনে মনে ভাবে জীবনের অঙ্কে সে যেখানে শূন্য পেয়েছে, কোনো সার্টিফিকেটের বিনিময়েই সেখানে কোনো সংখ্যা বসানো যাবে না। তার বঞ্চনা যে চিরকালের!

৬.

এবার চাকরি চাই। দ্বিতীয় পর্যায়ে লড়াই শুরু করে রানি। এই পর্যায়ে তাকে খুব বেশি সংগ্রাম করতে হয়নি। তার ঈপ্সিত লক্ষ্য ছিল বি.এ., বি.টি. পাশ করে স্কুল শিক্ষিকার চাকরি। বছর খানেক চেষ্টার পর সে স্কুল শিক্ষিকার চাকরি পেয়ে গেল অন্য কারুর সাহায্য ছাড়াই। কোয়ার্টার পাবার জন্য তাকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হল। অবশেষে সে তার ছেলে-মেয়ে-স্বামীসহ নিজস্ব কোয়ার্টারে চলে গেল। রানি স্বাধীন হল, ছেলেমেয়ে ও স্বামীকে স্বাধীনতা দিল।

এই দিনটা রানির কাছে চির-স্মরণীয় হয়ে থাকল। একদিকে বিচ্ছেদের বেদনা, অপরদিকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার আনন্দ। এ যেন রানির দ্বিতীয়বার 'পতিগৃহে যাত্রা'। দীর্ঘ বছর পিতা-মাতা, ভাই-বোন সবার সঙ্গে সুখ-দুঃখ ভাগ করে এক সঙ্গে থাকার পর এই বিচ্ছেদ রানির পক্ষে অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়েছিল। অপর পক্ষে দীর্ঘ বছর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রতি মুহূর্তে বাধা-বিপত্তিকে অতিক্রম করে কাঙ্ক্ষিত বস্তুকে পাওয়ার আনন্দ! নিজ কর্মের সফলতা প্রাপ্তির আনন্দ বোধ হয় অন্য সমস্ত রকম আনন্দকে ছাপিয়ে যায়।

এতদিনে শুরু হল রানির নতুন স্বাধীন সংসার। মনে মনে ভাবে দুঃখের অমানিশা শেষ হয়েছে। দুঃখের অতীতকে ভুলে বাকি জীবনটা এদের নিয়ে আনন্দে কাটিয়ে দেবে। ভাবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তার স্বামী নিশ্চয়ই একটু সহানুভূতি, একটু উদারতা, একটু কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি বোধের দ্বারা তাড়িত হয়ে তার সঙ্গে সঙ্গত ব্যবহার করবে যা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা হবার নয়। অক্ষম পৌরুষত্ব প্রায়শই হীনমন্যতাবোধের শিকার হয়। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। হীনমন্যতা বোধে আক্রান্ত হয়ে ভদ্রলোক যখন তখন কোনো কারণ ছাড়াই চিৎকার চেঁচামেচি করে পরিবেশকে অসুস্থ করে তুলতো এবং রানির খুশিকে ম্লান করে দিত। তার সমস্ত রকম সক্ষমতাকেই ভদ্রলোক প্রতি মুহূর্তে ইচ্ছাকৃত ভাবে উপেক্ষা করত। একটা বাক্য রানি প্রায়ই শুনত ভদ্রলোকের কণ্ঠে—'জুতোর শুকতলা চিরকাল পায়ের তলাতেই থাকে।' পুরুষশাসিত সমাজে শাসক পুরুষের কণ্ঠস্বর, তা যতই অন্তঃসারশূন্য হোক না কেন।

আসল রোগটা কোথায় বুঝতে পেরে রানি সব মুখ বুজে সহ্য করে। মাঝে চেষ্টাও করে যুক্তি, বুদ্ধি দিয়ে কিছুটা বোঝাতে, মার্জিত করতে। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। মনে মনে ভাবে, যত্ন ও পরিশ্রম করে মানুষ বাস্তব অবস্থাকে পাল্টাতে পারে, কঠিন বস্তুরও রূপান্তর ঘটাতে পারে, কিন্তু মানুষের মানসিকতাকে সম্ভবত পারে না।

জন্মলগ্ন থেকে উপেক্ষিতা রানি সমস্ত উপেক্ষাকেই সহ্য করে নির্বিবাদে। সম্ভবত এটাই রানির একমাত্র অপরাধ। মনকে সে সান্ত্বনা দেয় এইভাবে—মূল্যবোধই যেখানে নেই সেখানে মূল্য পাবার আশা করাটাই বোকামি। আমাদের অবহেলায় কত মূল্যবান জীবনই তো নষ্ট হয়ে গেছে এই পৃথিবীতে। রানি তো তুচ্ছ সাধারণ মেয়ে। ধীরে ধীরে সে নিজেকে গুটিয়ে নিতে থাকে নিজের মধ্যে। অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে নিজের অন্তরকেই সে বিশ্লেষণ করতে থাকে। চেষ্টা করে নিজেকে ক্ষুদ্র চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে তুলে নিতে, সেখানেই খুঁজে পেতে চায়

সত্যিকারের শান্তি। কিন্তু সংসার থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ ভাবে পৃথক রাখতে পারে না, কারণ কর্তব্য তো শেষ হয়নি তখনও। ছেলে-মেয়েদের বড় করে, তাদের বিয়ে দিয়ে তবেই তার কর্তব্য শেষ হবে। সেই সময় পর্যন্ত তাকে সহ্য করতেই হবে সব কিছু।

এরপরে কয়েক বছর কেটে যায়। সময় মতো ছেলে মেয়েদের এক এক করে বিয়েও দেয় যোগ্য পাত্র পাত্রী নির্বাচন করে। এবার সে ছুটি নেবে এই সংসার থেকে। স্রোতের প্রতিকূলে চলতে চলতে চলতে শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকেই রানি বড় ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত ও অবসাদগ্রস্ত। তবুও হাল সে ছাড়ে নি। হাল ছাড়লে নৌকো যেত ডুবে। উপযুক্ত কাণ্ডারীর অপেক্ষায় সে দিন গুনেছে এতদিন। এবার উপযুক্ত কাণ্ডারী পুত্রবধূর হাতে সংসারের সব দায়িত্ব সঁপে দিয়ে সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ব্যক্তিগত কয়েকটি নির্দিষ্ট কাজ ছাড়া আর সে কোনো কাজই করে না। নিজস্ব মতামত কারুকে জানায় না, বাধা দেয় না অন্য কারুর ইচ্ছা বা মতকে। এইভাবেই সে ক্রমশ নিজেকে নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিতে থাকে। তার একমাত্র প্রার্থনা, যাদের জন্য সে তার জীবন-যৌবন, দিনের খাবার, রাতের ঘুম সব কিছু বিকিয়ে দিয়েছিল তারা যেন সকলে নিরোগ শরীর নিয়ে সুখে থাকে, ভাল থাকে।

সকলের মাঝে থেকেও রানি নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করে। এতে সুখ বা শান্তি পাওয়া না গেলেও স্বস্তি পাওয়া যায়। বিশ্লেষণী মন নিয়ে সে ফিরে যায় সুদূর অতীতে, তার কর্মময় জীবনে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে কোথাও তার ভুল ছিল কিনা, এর থেকে আরও ভাল কিছু করা যেত কি? উত্তর খুঁজতে গিয়ে চোখ কেবলই জলে ভরে আসে। পুরনো ক্ষতগুলো থেকে রক্ত ঝরতে শুরু করে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা টনটন করতে থাকে। বার বার চেষ্টা করে সে অতীতকে ভুলে থাকতে। কিন্তু বার বারই তার সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। অবশেষে তার সব থেকে প্রিয় সঙ্গী সঙ্গীতের কাছে আশ্রয় চায়, সাহায্য চায়। সাহায্য পায়ও। অতীত ও বর্তমানের প্রিয় গানগুলি গুন গুন করে গায়। কখনও কখনও রাত্রি ভোর হয়ে যায়, টেরও পায় না। সুরের মধ্যে ডুবে থাকে সে। চোখের জলে কখন বালিশ ভিজে যায় টেরও পায় না। এইভাবেই চলতে থাকে রানির জীবনের শেষপর্ব।

মাঝে মাঝেই একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা, একটা অপরাধবোধ তাকে খোঁচা মারে। রানি চেয়েছিল দুঃখ-কষ্টের ভেতর থেকেই সে তার ছেলে-মেয়েদের যথার্থ মানুষ করে তুলবে, যত কষ্টই হোক, তাদের সে উচ্চশিক্ষা দেবে। তাদের চারিত্রিক ও মানসিক গঠন হবে সুন্দর, সরল ও নির্মল। বাহ্যিক ঐশ্বর্য না থাকলেও অন্তরের ঐশ্বর্যে এরা হবে ঐশ্বর্যশালী। কিন্তু তা কি সে পেরেছে? না, পারেনি। এর জন্য প্রয়োজন ছিল একটু স্বাধীন, সুন্দর পরিবেশ, স্বল্প স্বাচ্ছন্দ্য ও সুস্থ মানসিকতা। সর্বোপরি যেটা প্রয়োজন ছিল তা হল সন্তানের প্রতি মায়ের স্বতঃস্ফূর্ত অধিকার। এর কোনোটাই সে পায়নি। সন্তানের প্রতি অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রেও পেয়েছে প্রচণ্ড বাধা। আজ পরিণত বয়সে এসে তার মনে হয় কেন প্রচণ্ড প্রতিরোধের দ্বারা সে সেই বাধাকে অতিক্রম করেনি? কেন? সেটাই ছিল তার দুর্বলতা আর এই দুর্বলতাই তার অপরাধ। তাই অপরাধের শাস্তি তো পেতেই হবে তাকে। তাই তো সে যখন তার সন্তানদের কোনো কথায় বা ব্যবহারে আঘাত অথবা উপেক্ষা পায়, তখন তীব্র মানসিক কষ্ট পায় ঠিকই, কিন্তু তাদের অভিযুক্ত করতে পারে না। কারণ তাদের তো কোনো অপরাধ নেই! রানি তো পারেনি শৈশবে তাদের কোলের কাছে বসিয়ে, বুকের পাশটিতে নিয়ে গল্পের মাধ্যমে রীতিনীতি শেখাতে। পারে নি তো পাঠ্য পুস্তক নিয়ে একসঙ্গে বসে পড়াতে। প্রয়োজন অনুসারে উপযুক্ত খাদ্য খাইয়ে পারে নি তো তাদের শরীর গঠন করতে। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের মানসিক সুস্থতা দিতে পারেনি তো। তবে আজকে সে তাদের কাছ থেকে সঙ্গত, শ্রদ্ধাযুক্ত, বিনম্র ব্যবহার আশা করে কী করে? তারা যতটা ভালো হয়েছে তা তাদের নিজের গুণেই। রানি তাদের কোনো শিক্ষাই দিতে পারেনি।

একদা উপেক্ষা দিয়েই যে জীবন শুরু হয়েছিল উপেক্ষা দিয়েই সে জীবন শেষ হবে। এতে দুঃখের কিছু নেই। এটাই যেন প্রত্যাশিত ছিল। রানি এই বলে নিজেকে সান্ত্বনা দেয় যে, এই পৃথিবীতে কত নারীই তো যবনিকার অন্তরালে, সকলের অগোচরে উপেক্ষিতা রয়ে গেছে। কে তাদের খবর রাখে?

রামায়ণ মহাকাব্যে নারী চরিত্রগুলির মধ্যে সীতার চরিত্রই আমাদের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। স্বামী-সহগামিনী সীতার দুঃখে আমরা দুঃখ পাই, সুখে পাই আনন্দ। অশোক বনে স্বামী বিরহে কাতরা সীতার জন্য আমরা চোখের জল ফেলি কিন্তু রাজ-অন্তঃপুরে পর্দার অন্তরালে দীর্ঘ চোদ্দ বছর স্বামীসঙ্গ বঞ্চিতা ঊর্মিলার দীর্ঘশ্বাস আমরা শুনতে পাইনা। দেখতে পাইনা তার নিরবচ্ছিন্ন চোখের জল। মহামুনি বাল্মীকি যাকে উপেক্ষা করেছে, সাধারণ পাঠক তাঁকে দেখবে কী করে?

মহাকবি কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা চরিত্রই প্রাধান্য পায়। প্রথম পর্বে আমরা দুষ্মন্তের প্রতি প্রেম-বিহ্বল শকুন্তলাকে দেখতে পাই। দ্বিতীয় পর্বে দেখতে পাই স্বামী কর্তৃক অস্বীকৃতা, লাঞ্ছিতা, নিগৃহীতা শকুন্তলাকে। পরিশেষে পুত্রসহ দুষ্মন্তের সঙ্গে মিলিত পরিপূর্ণ শকুন্তলাকে দেখতে পাই। যে অভিজ্ঞানের জন্য দুষ্মন্তের স্মৃতি-বিভ্রম, সেই অভিজ্ঞানের জন্যই পুনরায় তাঁর স্মৃতি-উদ্ধার ও শকুন্তলা প্রাপ্তি। এবং যে অভিজ্ঞানই দিল নাটকের গতি ও সুন্দর পরিণতি, সেই অভিজ্ঞান নাটকে কে আনল? প্রিয় সখীর ভবিষ্যৎ অনিষ্ট আশঙ্কায় ভীত হয়ে অনুসূয়া এবং প্রিয়ংবদা দুর্বাসা মুনির কাছে আকুল প্রার্থনা করে এই 'অভিজ্ঞান' এনেছিল সবার অলক্ষ্যে। নাটকের শেষ পর্যন্ত এদের নাম আর উল্লেখিত হয়নি। নাটক এবং শকুন্তলার পূর্ণতা প্রাপ্তির পশ্চাতে যাদের নিঃস্বার্থ অবদান, সেই অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদা রইল কণ্বমুনির আশ্রমে লতা-বিতানের অন্তরালে।

এদের কথা স্মরণ করে রানি আস্বস্ত করে নিজেকে। এদের তুলনায় কত তুচ্ছ সে। কত সামান্য তার অবদান। তার জীবন দেবতার কাছে শুধু একটাই আকুল প্রার্থনা জানায় সে, যেন তিনি তাকে ছুঁড়ে ফেলে না দেন অবজ্ঞা ও উপেক্ষার অন্ধকারে। প্রসারিত দু-বাহু দিয়ে তিনি তাকে যেন তুলে নেন তার বক্ষে।

তাই তো সে দিনরাত গুন গুন করে তার প্রিয় রবিঠাকুরের গান—

চরণ ধরিতে দিও গো আমারে,
নিও না নিও না সরায়ে।
জীবন-মরণ সুখ দুখ দিয়ে
বক্ষে ধরিব জড়ায়ে।
স্খলিত শিথিল কামনার ভার
বাহিয়া বহিয়া ফিরি কত আর?
নিজ হাতে তুমি গেঁথে নিও হার
ফেলোনা আমারে ছড়ায়ে।।
চির পিপাসিত বাসনা বেদনা,
বাঁচাও তাহারে মারিয়া।
শেষ জয়ে যেন হয় সে বিজয়ী
তোমারি কাছেতে হারিয়া।।
বিকায়ে বিকায়ে দিনু আপনারে,
পারিনা ফিরিতে দুয়ারে দুয়ারে।
তোমারি করিয়া নিও গো আমারে
বরণের মালা পরায়ে।।

With Best Compliments of

Sauvik Banerjee
Mandira Banerjee
Mainak Banerjee

Vill. & P.O. Nabagram
Burdwan

Sl. No. 29

With Best Compliments of

Kendra Colliery Employees
Co-operative
Credit Society Ltd.

Regd. No. 477, Dated : 10-04-79

Vill. & P.O. Khandra, Dist. Burdwan

Sl. No. 27

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

আর্থসামাজিক উন্নতির একমাত্র পথ সমবায়

Ukhra Regional Workshop
Employees Co-operative
Credit Society Ltd.

Sl. No. 28

With Best Compliments of

MUKHERJEE
CONSTRUCTION CO.

Transporter, Civil Contractor
& General Order Supplier

Jamgorah, Burdwan

Sl. No. 25

সেদিনের শেষে

দেবদত্ত রায়

সাহানারা পূজারী বামুন। এ তল্লাটে সাত পুরুষের বাস। কে না জানে ওদের? চেনে না কে? বেরিয়ে এসেছিল দেবীদাস। বেড়া ভেঙে। খাঁচা ডিঙিয়ে। বাবা বলেছিলেন, অপগণ্ড, পৈতেটা তোর সাজে না। কি করে খাবিরে ছোঁড়া? দাদা-ভাইদের পা চাটা হয়েই তো থাকতে হবে রে। চিরটাকাল।

মা হেম, মানে হেমলতা ঘোমটার আড়াল থেকে শুধু ফোঁপাতেন, ছেলেটাকে শুধু গালিগালাজ। দিনভর। নিশ্চিন্তে দুটি খেতে তক দেয়না। আর তোকেও বলি, তুর কোনো মন-ও নাই। না, লাজ-সরমও না। সব্বাই যে অত দুত্তোরি করছে। দুয়ো দিচ্ছে তোর কানে যাচ্ছে না? যায় না?

দেবীদাস শুধু দাঁত বার করে হাসে। সরল সোজা বোকাদের মতো। ভাবটা অনেকটা সব্বাই বলছে তো আমার কী? বলুক না যত পারে বলুক। বলতে বলতে মুখ ব্যথা হয়ে গেলেই থেমে যাবে। না শুনলেই হলো।

গাঁয়ের বাঁশলী মন্দিরে প্রধান পুরোহিত এ বাড়ির প্রধান। আদিত্য বামুন। পাড়ার বিয়েঘরেও তারই ডাক পড়ে। কেউ ডাকে বামুনদাদা। কেউ আবার কাকা, জেঠা। মামাও ডাকে অনেকেই। বাড়িতে ঢুকলে পা ছুঁয়ে নম করে ছেলে বৌ থেকে মা-মাসি-শাশুড়ি-শ্বশুরকে।

আদিত্যনাথ ডান হাতের মধ্যমায় প্যাচ তুলে স্মিত হাসেন। আশীর্বাদ করেন—দীর্ঘজীবী হও বাবারা। বেঁচে থাকো একশো বছর। শতায়ু ভব।

সবাই তাতেই গদগদ। আদিত্য বামুনের মনে দারুন স্বস্তি। চোখেমুখেও ফুটে ওঠে তা। গাঁয়ের তিন চারটে বাখল। সব বাখলেই মান্যতা পান।

সেই আদিত্য বামুনের দু নম্বরের ছেলেটা তার কুলের সবকিছু ওলট পালট করে দিলে-গা। বেটার ছেলে বেটাকে পৈতেটাতক দেওয়াতে পারল না। দেবীদাস হাসে আর বলে, ও সব ভড়ং। এই ভড়ং আমার ভালোলাগে না। তোমরা সবাই করো না যা করছ, একজন না করলে কি হয়? কিসসু না। বাইরে তোমরা না বললে কেউ জানতেই পারবে না।

কথা উঠলে এমন ভাবেই কাটান দেয়।

কাটান দিলেই হল? জেঠা-কাকারা চোখ ববড় করেন, হ্যাঁরে দেবু অমন বলতেই হয়?

—ক্যান্? না হওয়ার কী আছে?

—ঘরে যে নারায়ণ শিলা রয়েছে রে! ছোঁয়া ছোয়াত হলে পাপ হবে যে রে? জানাজানি হলে কেউ মান্যি করবে? পেটের ভাত উঠে যাবে যে রে!

দেবীদাস নির্বিকার। তার সেই সোজা সরল হাসি। মন খোলা দন্তপ্রদর্শন।

যে যে ভাবেই পারে বোঝাতে চেষ্টা করে। দেবীদাস বোঝে না। দেবীদাস নিজের চালেই চলে। নির্বিকার। নিরালম্ব।

নিয়ম করে সকালে বেরোয়। তার হিসেব তার কাছে। থাকে তো দক্ষিণের ঘরে। উত্তরে ভায়াতদের ঘর। যার যেমন ভাগে পড়েছে। তবে ঐ নামেই। যাওয়া-আসা-চলা-ফেরা সব মিলিজুলি। বৌ-ঝিদের মধ্যেও তেমন কোনো গরমিল নেই। অন্তত বড়সড়। কেবল এক কাঁটা বড়ঘরের বেয়াদপ এই ছেলেটা। যত খটকা, যত ঠেস দেবীদাসকে নিয়ে। এই এক ছোটোখাটো অশান্তি!

দেবীদাসের আসল ঠেক সেই জোড়তল। বট-অশ্বত্থ আর অর্জুনের

জোড়। কতকালের গাঁয়ের কেউ বলতে পারে না। সকাল থেকেই লোক-জনা জমতে থাকে। বসে গেজায়। হাসি ঠাট্টা মৃদু হৈ-হল্লা। খবরাখবর। এ পাড়ার, ও পাড়ার। রাজ্যের-দেশের। এমন কোনো বিষয়ই নেই জোড়তলের চর্চায় আসে না।

দেবীদাসের দারুন লাগে। লেপ্টে বসে সবার সঙ্গে। শোনে আর মজা পায়। কত খবর যে জানতে পারে, কানে যায় তাতেই খুশি দেবীদাস। কে কোথায় রাজা হচ্ছে—কাকে মারছে কাকে সাটাচ্ছে কাকে ধরছে সব কানে যায় তার। চোখ চকচক করে ওঠে। আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কান পাতে। শোনে আর ঢোক গেলে।

কিছু মজার কথা—দেবীদাস কিছু বলে না। একটি শব্দও বের হয় না ওর মুখ থেকে। সে শুধু শুনেই যায়। শুনেই যায়। একদল আসে, বসে। জিরোয়। সময় হলে উঠে যায়। আবার আরেক দল এসে শূন্যস্থান পূরণ করে। দেবীদাস কৌতূহলী স্রোতা। মুগ্ধ স্রোতা। ওর যাওয়ারও কোনো তাড়া নেই।

যাওয়ার তাড়া তো তাদের যাদের যেতে হয় ডান থেকে বামে। বাম থেকে ডানে। জোড়তলের গা ঘেঁষেই বেরিয়ে গিয়েছে লাল কাঁকুড়ে সড়ক। আগে ছিল পায়ে হাটা মাটির। তখন মানুষজনা এ পথ দিয়েই ডান থেকে বামে যেতো। বাম থেকে ডানে। তারপর আওয়াজ উঠল, এ রাস্তা কবে পাকা হবে? হবে কিনা?

পাকা তো হলো না। তবে লাল কাঁকড় পড়ল একদিন। বিছানো হলো। দেবীদাসও দেখেছে তা। শুধু দেখেইছে। কিন্তু উচ্চবাচ্য কিছু তার ছিল না। তবে তার কাছে জোড়তল একই রকম। আবার কিছুদিন গেছে। আবার হৈ চৈ, আবার চেল্লাচেল্লি। মাঝখানে জোড়তলের এপাশে ওপাশে দু'একটা করে ছাবড়া উঠেছে। কেউ বসেছে চা-পকৌড়ি নিয়ে। কেউ বা বস্তা বিছিয়ে—লাউ, কুমড়ো, শশা, লংকা সব চাষের ফসল উদ্বৃত্ত যা, তা নিয়ে এসে বসেছে। বেচেছে, উঠে গিয়েছে আবার। সবার মুখেই হাসিখুশির ভাব। তা করতেই সে পথে চললো দু-দুটো বাস। সোনার বাংলা আর মায়ের আঁচল। ডান থেকে বামে যেতে মৌখিরার এই জোড়তলে এসে থামতে শুরু করে দিল। আবার ফিরে আসতো বিকেলের দিকে। লোকজনের সুবিধাই হলো। তারপর আরও একটা মায়ের আঁচল দশটায়-চারটায়। দেবীদাসের চোখের ওপরই তো। দেবীদাস তা-ও দেখল সেই জোড়তলে বসেই। দুপুরে বাড়িতে খেতে ঢোকা। খাওয়া হয়ে গেলে শুকনো গামছা একটা নিয়ে চলে আসা জোড়তলে। বিছিয়ে টানা একটা ঘুম। হৈ চৈ হল্লা—ছোটোখাটো হলে ঝেমেলা খুব কিছু হতো না। ঘুমের ব্যাঘাতও না। ঘণ্টা দেড়েকের ঘুম সেরে আবার উঠে জটলায় যোগ দেওয়া। মনোযোগ দিয়ে তাদের কথাবার্তা শোনা। সে শুধু শুনেই যেতো। কিন্তু সে সব শুনে তার যে কোনো বিকার হতো, কিংবা সে তাতে অংশ নিতো—এমনটা কেই বা দেখেছে? কেউ না। মাঝে মধ্যে চেনা-আধাচেনা কেউ যদি চা-বিড়ি এগিয়ে দিতো খুশি মনেই সে-ও হাত বাড়িয়ে দিত। না বিনয় করে তা ফিরিয়ে দিত না। এ ব্যাপারেও ছিল নির্বিকার। বিনয় করে ফিরিয়ে দিয়ে খুউব একজন নীতিবাজ বনার ইচ্ছে ছিল না। আবার চা-পিপাসা পেলে কারো থেকে চেয়ে চিন্তে হ্যাংলা পিরিত দেখাতো না। এ রমই দেবীদাস। তবে কারো কিছু হলে ঝাঁপিয়ে পড়তে আগু পাছু ভাবেনা। একদম না। দিনের শেষে সূর্যি লাল আলো দেখাতে দেখাতে ডুবে গেলে ফিরে আসতো স্ব-গৃহে। ধীরে সুস্থে। শ্লথপায়ে। সবাই জানতো, সাহানাদের ঘরে এক অপগণ্ড। কুড়ের বাদশা। না কোনো কাজের, না কোনো খোঁজের। মানে মানবজাতির সন্তান হিসেবে ধর্তব্যের মধ্যেই ছিলনা দেবীদাস। কথা উঠলেই মুখ বাঁকাতো, ছ্যা, ছ্যা, ওটা আদি ঠাকুরের ছেলে কে বলবে? ডোম বাউড়িদের সঙ্গে যে ভাবে মেশে, চলা ফেরা করে। বামুন হয়ে। ধুর। ধুর।—এসব নিয়েও কোনো হেলদোল নেই ছেলেটার। তবে নেশার মধ্যে নেশা কোথাও যদি কোনো সভার নাম শুনতো—জড় হয়ে যেতো সেখানে। বক্তৃতা শুনতে খুউব ভালোবাসতো। মিটিং টিটিং হলে একদম মঞ্চের যতো কাছে বসা যায়। বাঁশ দিয়ে ঘেরা বাদ দিয়ে প্রথম সারিতে দেবীদাস গ্যাঁট হয়ে বসে পড়তো। কোথাও মহিলাদের আলাদা ব্যবস্থা থাকলে—তাদের সীমানার পরেই করে নিতো নিজের স্থানটুকু। দিব্বি মনোযোগ দিয়ে শুনে যেতো নেতাদের ভাষণ। নেতাদের গরম গরম ভাষণ শুনলে—ভেতরে ভেতরে তেতে যেতো। গরম হয়ে উঠতো তার দেহমন। আবার করুণ কাহিনি শুনে চোখে জলও এসে যেতো। চোখ মুছতে মুছতে সবার শেষেই প্রায় উঠে আসতো। পা চালাতো টেনে টেনে। কখনও মন লেগে গেলে সেকি উদ্বাহু নাচ। পাড়া পথ ঘাট মাতিয়ে চলতো দেবীদাস।

গাঁয়ের লোক এসব দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গিয়েছে।

বাড়িতে ঢুকেও একই অবস্থা। দেবীদাস যে বাড়ির ছেলে তা যেন মোটেই নয়। বাড়িতে গরু, ছাগল, বেড়াল কুকুর যেমন আছে—তেমনি দেবীদাস আছে।

কিন্তু হেমলতার কাছে তো তেমন নয়। পেটে তো ধরেছে নাকি? তাহলে কী করে অ-স্বীকার করে। দুথালা দুবেলা হেমলতাই এগিয়ে দেয়। চৌকাঠ ধরে ফেলনা ছেলে তার, কেমন গোগ্রাসে গেলে—তাই দেখেন। দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেন। কত কথাই তো কতদিন বলেছেন। অভিমান করেছেন। মৃদু তিরস্কারও করেছেন। কিন্তু কানে গেলে তো? তাই এখন আর কিছু বলেনও না।

দেবীদাস এ বাড়ির পোষ্য। তাই থাক সে।

কিন্তু, হঠাৎ সেই দেবীদাস গাঁয়ের হিরো হয়ে গেল।

প্রতিদিনের মতোই শুক্কুরবারে সকালবেলায় একথালা পান্তুভাত সংগে লংকাপোড়া আর অতি সামান্য এক চামচ সরসেতেল কচলে মেরে, মায়ের খানিক অভিমান ভরা উদগার কানে শুনে, নিজের মতোই দাঁত বার করা এক মুখ হাসি মেখে দিব্বি গেট পেরুল বাড়ির। গেট পেরুতে গিয়ে বাপের মুখোমুখি,—গেলা হয়ে গেল? বেরুচ্ছ যখন মা-মণি কি আর না খাইয়ে ছেড়েছে? তা এখন যাওয়া হবে কোথায়?

বাপের এবংবিধ প্রশ্নে কিন্তু মাথা নুইয়ে একদম নিঃশব্দ নখখোঁটা ছাড়া কিছুই করার থাকে না দেবীদাসের।

তাতে বাপের ভেতর ঠাণ্ডার চেয়ে তেতেই ওঠে—ওফ্, চুপ করে আছে দেখ! কানে যেন একটি শব্দও ঢোকে নি। কী হলো? যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

দেবীদাস মুখ নিচু করে শুধু কোনো রকমে বলে ফেলে—কোথাও না।

—তাই হয়? ঠ্যাং দুটো নিয়ে বেরুচ্ছ। আর কোথাও যাচ্ছ না এটা হয়? যাও, ঘুরে আস জাহান্নাম থেকে। চলে এসো আবার গেলার সময় হলে। নইলে তোমার মা-মণিটি আবার না গিলে উপোস দিয়ে পড়ে রইবেন যে। সেটা যেন মনে থাকে।

বলতে বলতে অন্তর বিক্ষোভ নিয়ে ঢুকে পড়েন। আদিত্য সাহানা। স্বগৃহে।

মুখে তখনও—ধুর-ছাড়। ঘরে তো আসা শুধু গেলার জন্যে। নিকম্মা কাহাকার।

দেবীদাসের কোনো হেলদোল নেই। নির্বিকার সে। বাপের কথায় তার না হয় অনুতাপ। না অনুশোচনা। ঢিলে ঢালা পা ফেলা। কাঁকড় বিছানো পথের দুধার ধরে পা ফেলে ফেলে আগে বাড়া। উদ্দেশ্য সেই জোড়তল। পথ চলতি কে গেলো, কে এলো, না, কোনো নজরই নেই তার। যেমন হাঁটে রোজ তেমনি চলা। হয়তো এমনি ভাবেই পৌঁছে যেতো আজও। কিন্তুক তা আর হলো না আজ। ডান দিকে মোড় ঘুরে পা ফেলতেই মাঘা মাস্তানের ক্লাব থেকে তীব্র এক চিৎকারে তার কান খাড়া হয়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে পা আটকে যায় যেন। কান পাতে। আবার সেই আর্ত চিৎকার—বাঁচাও গো—তোমরা কে আছ? বাঁচাও না গো তোমরা। সঙ্গে করুণ ফোঁপানি—বাঁচাও না তোমরা।

হঠাৎ মুখ চাপা গোঙানি। কানে আসে দেবীদাসের। আশেপাশে চলা মানুষজনারও নির্ঘাৎ। দেবীদাস এদিক ওদিকে তাকায়। চোখে পড়ে সব্বাই কেমন যেন প্রাণভয়ে প্রায় ছুটছে। ঠিক সেই ক্ষণে আবার চিৎকার, গোঙানির মতো চিৎকার।

দেবীদাস বুঝতে পারে কিছু একটা হচ্ছে সেখানে। মাঘা মাস্তানের ক্লাবে কিছু না কিছু ঘটেই থাকে। ভয়ে কারো কিছু বলার জো নেই। কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে বলবে? সুতরাং মানে কাজে-কাজেই।

আবার চিৎকার—ও মা-গো, তোমরা একবার কেউ আস না গ!

দেবীদাস আর স্থির থাকতে পারল না। তার ঢিলেঢালা শরীরটা হঠাৎ যেন টানটান হয়ে ওঠে। কী ভাবল কে জানে—এক ছুটে মাঘার কেলাবের সামনে এসে দরজায় ঠেলা মারে—অ্যাই দরজা খোল। খোল বলছি। কী হচ্ছে, হচ্ছে কী ভেতরে?

বাইরের গলা ভেতরে যেতেই মেয়েলি গলার আর্ত চিৎকার বারবার বাইরে আছড়ে পড়তে থাকে—আমাকে বাঁচান বাঁচান।

আবার মুখ চাপা।

দেবীদাস দাঁত কিড়মিড় করে কষে দরজায় দু-লাথ—এই শালোরা কারারে? খোল, খোল দরজা। নইলে কিন্তু ভেঙে দেবো। শুধু বলা নয়, সঙ্গে সঙ্গে গায়ের জোরে লাথ আর লাথ। ভেতরে ততক্ষণে ধস্তাধস্তির শব্দ কানে আসতে থাকে। দেবীদাস বাইরের দিকেও হাঁকতে থাকে—আরে আপনারা আসুন না—কী হচ্ছে ভেতরে কে জানে?

কিন্তু বাইরের কারো সাড়াই সে পায় না। ভেতরে প্রাণপণে চলছে ধস্তাধস্তি। আর কিছু ভাবতে পারলো না। গায়ের জোরে কাঁধ দিয়ে দরজায় ধাক্কা। আর ধাক্কা আর ধাক্কা।

হঠাৎ দরজার কপাট দুধারে খুলে যায়। দুম করে। চোখে পড়ে প্রায় রক্তাক্ত মেয়েটার মুখ। একটু ঠাহর করতেই চিনতে পারে, আরে এ তো মন্টু সাহার মেয়েটা। নজরে পড়তেই চিৎকার করে উঠে—এই শোরের বাচ্চা কী করছিস? করছিস কী তুই? ছাড় ওকে, ছাড় বলছি!

ঘুরে দাঁড়ায় মাঘা, কে-রে? ও ল্যালা তুই? দরজা ভাঙলি তুই? এই নেপলা ধরতো ওটাকে। দে চটাই। মার মার ওটাকে।

দেবীদাসের গায়ে যেন তখন অসুরের ক্ষমতা—মারবি আমাকে আয়। তার আগে তোদের দুটোকেই শেষ করে দোব। পাশেই পড়ে থাকা দাঁ-টার দিকে লক্ষ্য পড়ে দেবীদাসের। চোখের পলকে তুলে নিয়ে একলাফে টেবিলটার ওপর লাফিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দু-হাতে ঘোরাতে থাকে ধারালো দাঁ-টা। অবস্থা বেগতিক দেখে নেপলা ছুটে বেরিয়ে যায়। মেয়েটা ততক্ষণে পেছনের দিকে নিজেকে সামলে নেয়।

মাঘা তখনও চোখ রাঙিয়েই চলছে—এই ল্যালা ভালো হচ্ছে না বলছি। ভাগ এখান থেকে। ইতনা হিম্মত তোর? আমাকে দাঁ দেখাচ্ছিস। ভাগ্ নয়তো দুব গুলি করে।

—গুলি করবি কর! বুক ফুলিয়ে দাঁ হাতে এগিয়েই আসে। মন্টু সাহার মেয়েটা ততক্ষণে ছুটে বেরোয় ঘরের বাইরে।

বাইরে এসেই প্রাণপণে চেঁচাতে থাকে—অ্যাই আপনারা আসুন না। আসুন না সবাই। চিৎকার শুনে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে পড়তে থাকে। ক্রমেই জটলা বাড়ে। সব্বাই এবার গলা তোলে।

ভেতরে মাঘা মাস্তান কোমর থেকে অস্ত্র বার করার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে দেবীদাস—তার ওপর। টাল সামলাতে না পেরে মাঘা পড়ে যায় মেঝেতে। দেবীদাস চেপে ধরে তাকে। মাটির সঙ্গে ঠাসতে থাকে। ঝাঁপিয়ে পড়ে এবার বাইরের জটলাটাও। চলে ভাঙচুর। মুহূর্তের মধ্য ছড়িয়ে পড়ে সংবাদটা। জড়ো হয়ে যায় আরও মানুষজনা। এবং ছড়িয়ে পড়ে গাঁয়ের লালা-গোলা অকম্মা দেবীদাসই মাঘা মাস্তানকে কাবু করে দিয়েছে। যারা শোনে তারাই ছুটে আসে। তারাই ভিড় জমায়। সাক্ষী থাকতে চায় এমন একটা ঘটনার।

কখন যেন দেবীদাসকে কাঁধে চড়িয়ে সব্বাই এগিয়ে চলে কাঁকড় বিছানো পথ ধরে।

সংবাদ যায় সাহানাদের বাড়িও। আদিত্যনাথ শুনে থ' হয়ে যান। চোখ তার সজল হয়ে ওঠে। নিজের মনে বিড়বিড় করেন, সব্বাই যখন মাঘা মাস্তানের ভয়ে টু শব্দটি পর্যন্ত করার সাহস করে না তখন কিনা তার অপোগণ্ড ওই ছেলেটাই ...।

With Best Compliments of

A Well Wisher

Laudoha, Burdwan

Sl. No. 24

With Best Compliments of

Jambad Colliery Employees Co-operative Credit Society Ltd.

Regd. No. 215, Dt. 16-03-1990
P.O. Parasea, Dist. Burdwan

Prasanta Mukherjee
Manager

Sl. No. 34

With Best Compliments of

Khas Kajora Colliery Employees Co-operative Credit Society Ltd.

P.O. Kajoragram, Dist. Burdwan (W.B.)
PIN : 713338

Sl. No. 35

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

গণেশচন্দ্র পাত্র

শুকডাল, বুদবুদ, বর্ধমান
ফোন : ৯৪৭৪৩৭০৮৩৬

Sl. No. 18

With Best Compliments of

DHCPL

Durgapur

Sl. No. 22

গ্লানি

স্বপন ঘোষচৌধুরী

লোকে বলে রমাপতি খারাপ লোক।

পুরনো লোক যে কজন আজও বেঁচে বর্তে আছে তারা বলে, ওর বাপ যদুপতি ছিল আরও খারাপ।

ওই রসময় মল্লিক যার ধান জমি বাইশ বিঘে, পুকুর নিয়ে জল কর সাড়ে তিন বিধে এবং সাড়ে পাঁচ বিঘের বাঁশঝাড়, যে নাকি শত করেও সে যুগে মহাজন হতে পারেনি—পাল্লা দিতে গিয়ে হেরে গেছে বারাবর, সে যদুপতিকে বলে নম্বরী লক্কড়।

তা বাপের স্বভাবের কিছু কিছু কথা মনে আছে রমাপতির। ও তখন বার বছরের ছটফটে ছেলে—'বাবা বিস্কুট খাব' বলে দাঁত বের করে আব্দার করেছিল। বিস্কুটের বদলে ঠাস করে একখানা চড় কষিয়ে বাবা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠেছিল, বাঁদর, হাটতলার গাছে উঠে বটফল খা গিয়ে। একটা বিস্কুটে গুণেগুণে দুটো পয়সা লাগে জানিস!

ভ্যাঁ কান্নার মধ্যেও সেই কথাগুলো কানে ঢুকেছিল। আজও তা মনের মধ্যে গেঁথে আছে।

বাবা মারা যেতে রমাপতি মহাজনি কারবার হাতে নেবে কিনা ভাবতে বসেছে। বাবা ছিল কত তেজি। কী নাম যেন ওই খুনখুনে বুড়িটার, রোগা টিংটিং করছে বাঁশ পাতার মতো, ভূষো কালির মতো গায়ের রঙ, গলায় পেয়ারা সাইজের গলগণ্ড। বরফ সাদা চুল সমেত মাথা নাড়িয়ে বেশ চিৎকার করে বলেছিল—বলি যদুপতি, তোমার আক্কেলখানা তো বেশ!

—কীসের আক্কেল?

—বলি, বেনু ঘোষের পাকা ধান মাঠ থেকে বেমালুম তুলে নিয়ে এলে!

—এলুম। জমি দেখিয়ে টাকা ধার নেবে, শোধ করবে না, সুদ দেবে না!

—তাই বলে পাকা ধান কেটে নেবে?

—বেশ করব।

—পিশাচ! নরকেও তোমার ঠাঁই হবে না।

—নরকে যাচ্ছেটা কে, নরক নরক করছো?

—পাপের তো অন্ত নেই, রাজ্যি শুদ্ধু লোকের সম্পত্তি গর্ভে ঢোকাচ্ছো!

—বেশ করেছি।

—তা তো করবেই! কানু মোড়লের মেয়েটা তোমার জন্য গলায় দড়ি দিল।

—বেশ করেছে।

—ওই বেশ নিয়েই থাকো। গজগজ করতে করতে বুড়ি চলে গিয়েছিল।

রমাপতি কি বাপের মতো এমন কঠিন হতে পারবে? ছোটো মেয়েটা দেবু ঘোষের মেয়ের সঙ্গে আমতলায় বসে পুতুল খেলে। গতকালই দেবু এসে নগদ একশ টাকা ধার নিয়ে গেছে। শুধু হাতেই টাকাটা দিয়েছে। বাপের মতো একবারও বলতে পারেনি, থালা বাটি কাঁসা পেতল যা আছে নিয়ে এসো। ওই দেবু যদি টাকাটা শোধ করতে তিন মাস লাগায় রমাপতি কি বলতে পারবে, তোমার দক্ষিণ মাঠের জমিটা দখল নিয়ে নেব?

এক মাস হল বাবা মরেছে। ক্রিয়া কর্ম শেষ হয়েছে দশদিন আগে। এখনও রমাপতি মনস্থির করতে পারল না মহাজনি কারবারে মন দেবে কিনা। আজকাল ব্যাঙ্ক কম সুদে টাকা ধার দিলেও এই কারবার অনন্ত কাল ধরে চলবে। বাবা বলেছিল—জানবি মহাজন মানে মহাযম। যমের মতো কঠিন হবে। টলেছিস কি গাবিয়েছিস।

যম হতে হবে শুনে রমাপতির গা ঘিনঘিন করে উঠেছিল। বৌকে বলেছিল, সুদের ব্যবসা খুব খারাপ। তা ছাড়া দিনকাল ভালো নয়, ছেলে-ছোকরারা বড্ড স্বাধীন হয়ে গেছে। বাবার মতো আমাকে

মান্যি করবে কে? বলো দেখি কোন ব্যবসা করা যায়?

মাছের কাঁটা চিবুতে চিবুতে বৌ বলেছিল, মুদিখান করো। মনোরমা ভাণ্ডার। তোমার বৌয়ের নামটা সবাই জানতে পারবে।

রমাপতি ঢোক গিলে বলেছিল, এ আবার ব্যাবসা নাকি?

রমাপতি চিন্তিত। খুবই চিন্তিত। সাদা পাথরের মতো ন্যাড়া মাথাটায় ক্রমাগত হাত বুলিয়ে যাচ্ছে, জুতসই কোনও ব্যবসার কথা মনেই আসছে না। জানালার দিকে তাকিয়ে ব্যবসার অ থেকে চন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত ভাবতে ভাবতে দেখল বৃদ্ধ যতীন ভট্চায নামাবলী হাতে শালগ্রাম শিলা নিয়ে টুকুস টুকুস এগিয়ে যাচ্ছেন।

দেখে রমাপতির খুব কষ্ট হল। মনে পড়ল বাবার পাল্লায় পড়ে যতীনখুড়ো কেমন নাকাল হয়েছিলেন। বসত বাড়িটা চলে যেতে বসেছিল প্রায়। সে দিনও যতীনখুড়ো নামাবলী গায়ে শালগ্রাম হাতে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বাবা ডেকেছিল, যতীন শোনো!

বাঁ পাশে শ্যাওলা কাদা আর কচুরি পানায় ঠাসা পুকুর। পারলে যতীন সেখানেই লাফ দেন। নেহাত প্রাণের মায়ায় লাফ না দিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

বাবা বলেছিল, তিন মাস সুদ দিলে না, ব্যাপারখানা কী?

—দেব ভাই দেব, ওই তিনু মোড়লের মেয়ের বিয়ে বোশেখের দু তারিখে, ওটা মিটলেই দেব।

—সে তো এখনও একমাস।

—চার মাসের একসঙ্গে দেব।

বাবা হঠাৎ ঘাড় তুলে বলে উঠেছিল, তোমার হাতে ওটা কী, লাল কাপড়ে মোড়া?

—শালগ্রাম শিলা ভাই, নারায়ণ।

—পাথর আবার হলদে হয় নাকি? চকচক করছে।

—ওটা সিংহাসন। পেতলের তো, তাই চকচক করছে।

—সুদের বদলে ওইটে তা হলে দিয়ে দাও।

যতীনখুড়োর মাথায় বুঝি বজ্রাঘাত হল,—বলো কি যদুপতি? সুদ বলে নারায়ণের সিংহাসন নিয়ে নেবে! আমার নারায়ণ থাকবেন কোথায়?

—একটা শালপাতার ঠোঙা গোল করে মুড়ে নিও, দিব্যি সিংহাসন হয়ে যাবে। শালপাতা খুবই পবিত্র বস্তু, বৈকুণ্ঠেও শালপাতার খুব নাম।

সিংহাসনটা সেইদিনই বাবার হাতে চলে যেত যদি না ছোটোমামা কলকাতা থেকে ঠিক ওই সময়েই হাজির হতেন। ছোটোমামা বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় বাবা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, সেই সুযোগে যতীনখুড়ো হাওয়া।

মহাজন হওয়া অত সোজা? রমাপতি সিগারেট ধরাল। আকাশটা আজ আবার কেমন ফ্যাকাশে, রোদটা স্পষ্ট নয়। রমাপতির পিঠে পেটে ঘাম জমে উঠল। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে কাছেকাছে থাকে, তা সে যত প্রিয়জনই হোক না কেন, সব সময় মন জুড়ে থাকে না। কিন্তু মরে গেলে যেন ঘাড়ে চেপে বসে। উঠতে বসতে শুধু সেই মানুষটার কথাই মনে পড়ে। এই রোজ রোজ বাবার কথা ভাবতে আর ভাল লাগছে না। যখনই বাবার ভাবনা, শুধু প্রতারণার ছবি। যেমন এখন আবার মনে পড়ে গেল ছোটো বেলার কথা। ও তখন সেবেন কিংবা এইটে পড়ে। মহাজনি কারবার তখনও বাবা শুরু করেনি, গ্রামের খোঁয়াড়ের ডাক নিয়েছিল। খোঁয়াড়ের ছবিটা বেশ মনে আছে—চারদিকে ঘেরা বিশাল পাঁচিল। পাশে ছোট্ট একটুখানি চালা। বিশাল এক বটগাছ সমস্ত জায়গাটা ছায়া করে রেখেছে। সেই বটগাছের তলায় বাবা ঠায় বসে থাকত। গরু ছাগল ঢোকাবার জন্যে একটা মাত্র দরজা। গরু দিনে পঞ্চাশ পয়সা, ছাগল দিনে পঁচিশ পয়সা। ছাড়াতে এলে গরু একটাকা ছাগল পঞ্চাশ পয়সা।

সন্ধ্যে হলে বাবা ঢুঁ মারত দুলে, বাউড়ি পাড়ায়। পরামর্শ দিত, তোদের জন্যে খোঁয়াড় করেছি রে!

রতন খ্যাঁক করে উঠেছিল—আমরা কি গরু নাকি, তোমার খোয়াড়ে ঢুকব!

—অ্যাই দ্যাখো, রাগ করিস কেন? তোদের সুবিধের জন্যেই তো খোঁয়াড় নিলুম। এদিক ওদিক ঘুরিস, দুচারটে গরু ছাগল ধরে খোঁয়াড়ে ভরে দিলে দু-চারটে পয়সা পাস। সন্ধে বেলা নেশা ভাঙের জন্যে বৌয়ের কাছে আর হাত পাততে হয়না।

ফন্দিটা ওদের খুব ভালো লেগেছিল। তক্কে তক্কে থাকত, গরু ছাগল ধরত আর খোঁয়াড়ে চালান করে দিত।

কাঁচা পয়সার সেই থেকে আমদানি। তারই মধ্যে রতু মাঝি একদিন এসে বলেছিল—কত্তা, গরু ছাগল ছাড়া ছোটো খাটো জীব তোমার খোঁয়াড়ে রাখো না?

—ছোটো খাটো জীব? কুকুর বিড়ালের কথা বলছিস? না বাবা, ও সব খোঁয়াড়ে রাখার জিনিস নয়।

—না না, কুকুর বিড়াল নয়, তার চেয়েও ছোটো জীব।

—ইঁদুর?

—না গো কত্তা, ইঁদুর কেন হবে? রতু ফিসফিস করে বলেছিল, পুকুর থেকে খপাৎ করে তুলে নিয়েছি, ধবধবে সাদা হাঁস।

—এনেছিস বুঝি?

—হ্যাঁ গো কত্তা, পুঁটুলি করে চাদরের মধ্যে ঢোকানো।

বাবা বলেছিল, বড্ড ছোট্ট প্রাণী। এতো আর বড় খোঁয়াড়ে রাখা যাবে না, ছোটো খোঁয়াড়ে রাখতে হবে। নিয়ে যা চার আনা।

হাঁসটা দিয়ে সিকিটা ট্যাঁকে গুঁজে রতু মাঝি চলে যাচ্ছিল। বাবা ডাক দিয়েছিল, গরু ছাগল না পাস মাঝে মধ্যে হাঁসটা মুরগিটা ধরে আনবি। হাঁস এক সিকি, মুরগি দু সিকি।

হাঁসের পালক, ঠ্যাঙের টুকরো আর কাটা মুণ্ডটা রাত্রেই খালের জলে ফেলে দেয়া হয়েছিল।

এইসব কথা মনে পড়লেই রমাপতির বুকের মধ্যে সহস্র দামামা বেজে ওঠে। ইচ্ছে হয় সমস্ত চুরমার করে প্রলয় ঘটিয়ে দেয়।

সহসা দেখতে পেল জোয়ান মরদের মতো লম্বা লম্বা পা ফেলে হেঁটে যাচ্ছে হারু ঘোষ।

—এই যে হারু, কোথায় গেসলে?—রমাপতি বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

হারু হাসল, শ্যামপুকুরের নবীন হাজরা তোমার পিতৃদেবের পথ অনুসরণ করে পঞ্চভূতে বিলীন হয়েছেন। তার আত্মার সদ্‌গতি কামনায় একপেট খেয়ে এলুম। ওরা আমার বাঁধা খদ্দের কিনা!

রমাপতি পেটে হাত বোলাল, ন্যাড়া মাথায় হাত বোলাল, ঈষৎ আনুনাসিক স্বরে বলল, বড্ড ভাবনায় পড়ে গেছি।

এগিয়ে এল হারু, সিগারেট আছে?

রমাপতি সিগারেটের প্যাকেটটা লাইটার সমেত এগিয়ে দিল। সিগারেট বের করে ধরিয়ে একটা সুখটান দিয়ে হারু দিয়ে বলে উঠল, বাপের জমানো টাকাগুলো স্রেফ ফুঁকে উড়িয়ে দেবে নাকি?

রমাপতি বোকার মতো হাসল। হারুর ঠোঁট দুটো যেমন পুরু, দাঁতগুলো তেমনি বড়বড়। দু-মুহূর্ত হারুর মুখের সৌন্দর্য

নিরীক্ষণ করে বলল, তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ করব।

পরামর্শর কথা শুনে হারুর জিভ নড়ে উঠল, কিসের পরামর্শ ভাই?

—ভাবছি একটা ব্যাবসা করব।

—মহাজনি কারবার তুলে দেবে?

—এ বড় কঠিন কাজ।

—কঠিন বলে কঠিন!—হারু সিগারেটে লম্বা টান দিল। তেঁতুল গাছ লক্ষ করে ধোঁয়াটা ছেড়ে বলল,—লোহার চেয়েও কঠিন। তোমার বাবার কলজেটা ছিল ঘাটশিলার পাথর, কার সাধ্য তাকে গলায়! পোড়াতে গিয়ে দেখলে না, পাক্কা আটঘণ্টা সময় লাগিয়ে দিল। তা কী ব্যবসা করবে?

রমাপতি নাক চুলকে ঢোক গিলল,—সেটাই তো খুঁজে পাচ্ছি না। বেশ কম খাটনি বেশি লাভ এরকম একটা কিছু—

ছাই ঝেড়ে হারু বলল, বাঁধি কারবার কারো, খাটনি কম লাভ বেশি। তোমার তো টাকার অভাব নেই।

—আচ্ছা হারু! এগিয়ে এল রমাপতি—দেশি মদের জন্যে লাইসেন্স দিচ্ছে, ব্যবসাটা ভালো না?

—ভালো মানে অতি ভালো। দুধের ব্যবসার চেয়ে শত গুণে ভালো। ধার বাকির বালাই নেই, নগদ দাও মাল খাও।

—তোমার দুধের ব্যাবসাও কিছু খারাপ নয়।

হারু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে দিন আর নেই ভাই! কী করলুম সারাজীবন দুধ বেচে? বাইশ বিঘে ধানজমি একখানা দোতলা বাড়ি। লোকে বলে আমি নাকি জল বেচে এসব করেছি। বড্ড দুঃখ হয়!

—কিসের দুঃখ?

—অনেক দুঃখ! তার মধ্যে একটা ওই সিধু কামারকে দেখে। এককালে দা, কাস্তে, বঁটি, নরুণ, কুড়ুল তৈরি করত, ঝপ করে নেমে পড়ল পাঁঠা বলির কাজে। —হারু ওপর দিকে হাত জোড় করে প্রণাম সেরে বলতে লাগল, সবই মায়ের ইচ্ছে! স্রেফ পাঁঠাবলি দিয়ে চার বছরের মধ্যে তের বিঘে জমি কিনে ফেলল। ওকে বড়লোক করে দিল আঝাপুরের ওই ঠাকুর —কী যেন নাম—কী চণ্ডী যেন, বেশ ধূমধাম করে পুজো হয়। এক রাতে পাঁচশ পাঁঠা পড়ে। ধড়টি যারই হোক, মাথা আর বাঁ ঠ্যাংটি সিধুর। খদ্দের ফিট করা আছে, মাথা দশ টাকা, ঠ্যাং পঞ্চাশ টাকা। একরাতে বিশাল টাকা, কম কথা! সারা বছরই তো পাঁঠা চোটাচ্ছে। ওকে দেখবে তুমি, পাঁঠাগুলো মাঠে চড়ে বেড়ায় ও কেমন জুলুজুলু চোখে দ্যাখে। কে জানে মনে মনে বলে কিনা, খা ব্যাটারা; বেশি বেশি করে ঘাসপাতা খা, ঘাড়ে গর্দানে মাংস লাগা, ঘাড় সমেত মুণ্ডটা তো আমিই পাব।

হারুর কথা শুনে রমাপতি না হেসে থাকতে পারল না। বলে উঠল, পরের দেখে হিংসা করে লাভ কী? মদের ব্যবসা মহাজনি ব্যাবসার চেয়ে ভালো, বলো?

—নিঃসন্দেহে ভাল। কতলোক শোক তাপ ভুলতে তোমার দোকানে আসবে, জয়মা বলে চুমুক দিয়ে শোক তাপ ভুলে কৈলাসে চলে যাবে। রাগ কোরো না, বাপ তোমার সীমাহীন পাপ করে গেছে, তুমি তার হয়ে যতটা পারো প্রায়শ্চিত্ত করো।

—দেখি।—বলে রমাপতি ঘরে ঢুকলো।

বৌ তেলেবেগুন জ্বলে উঠে বলল, তোমার কি মতিভ্রম হয়েছে?

—কিসের মতিভ্রম?

—ছ্যাঃ, ছ্যাঃ? শেষকালে মদ বেচবে? বেচবে আর ঢুকুঢুকু নিজেও গিলবে! ম্যাগোঃ!

—মদের ব্যবসা কেউ করে না?

—যে করে করুক, তুমি করবে না। —বৌ মাতৃভাষায় ফিরে এল—মদের দোকান দিলে আমি গলায় দড়ি দিমু, কইয়া দিলাম!

রমাপতির শরীরটা নৌকোর মতো দুলে উঠল। বিষের সমুদ্রে ভাসছে একটা নৌকো। সেই নৌকোয় বসে আছে রমাপতি। রমাপতির নিজের ওপর খুব ঘেন্না হল। যেখানে যায় বাবার দুর্নাম। আকাশ বাতাস হিহি করে হাসছে। গাছপালা, মাটি পাথর ফিসফিস করছে। লক্ষ লক্ষ হাত ছুটে আসছে ওকে লক্ষ করে। এমন কোনও যুক্তি নেই যা দিয়ে বাবাকে মানুষের পাশে বসানো যায়।

বিষণ্ণ রমাপতি বিকেলশেষের রোদ্দুর আর লম্বা ছায়া দেখতে লাগল। চোখ গিয়ে পড়ল বাড়ির ভেতরের উঠোনে। ওর মেয়ে দেবুর মেয়ের সঙ্গে পতাকা ওড়াচ্ছে। সাদা চৌকো কাপড়ের টুকরো কঞ্চির ডগায় বেঁধে পতাকা করেছে। পতাকাটা তুলে দুজনে হাসি মুখে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে পড়ল বাংলা স্যারের কথা। বলতেন, সাদা, শুভ্র হচ্ছে সরলতার প্রতীক, বন্ধুত্বের প্রতীক। যা শুভ্র তা-ই সরল, তা-ই সত্য। যা শুভ্র তা-ই পবিত্র।

রমাপতি ওদের সামনে এসে দাঁড়াল,—কী খেলছিস?

—সন্ধি সন্ধি। তুমি খেলবে?

রমাপতি এক মুহূর্ত দেরি না করে বলে উঠল,—হ্যাঁ খেলব।

—নাও।—মেয়ে ওর হাতে পতাকা তুলে দিল, তুমি আগে আমরা পেছনে।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

'চলে যাব—তবু আজ
যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

সৌজন্যে

যাযাবর ইছাপুর অঞ্চল

Sl. No. 23

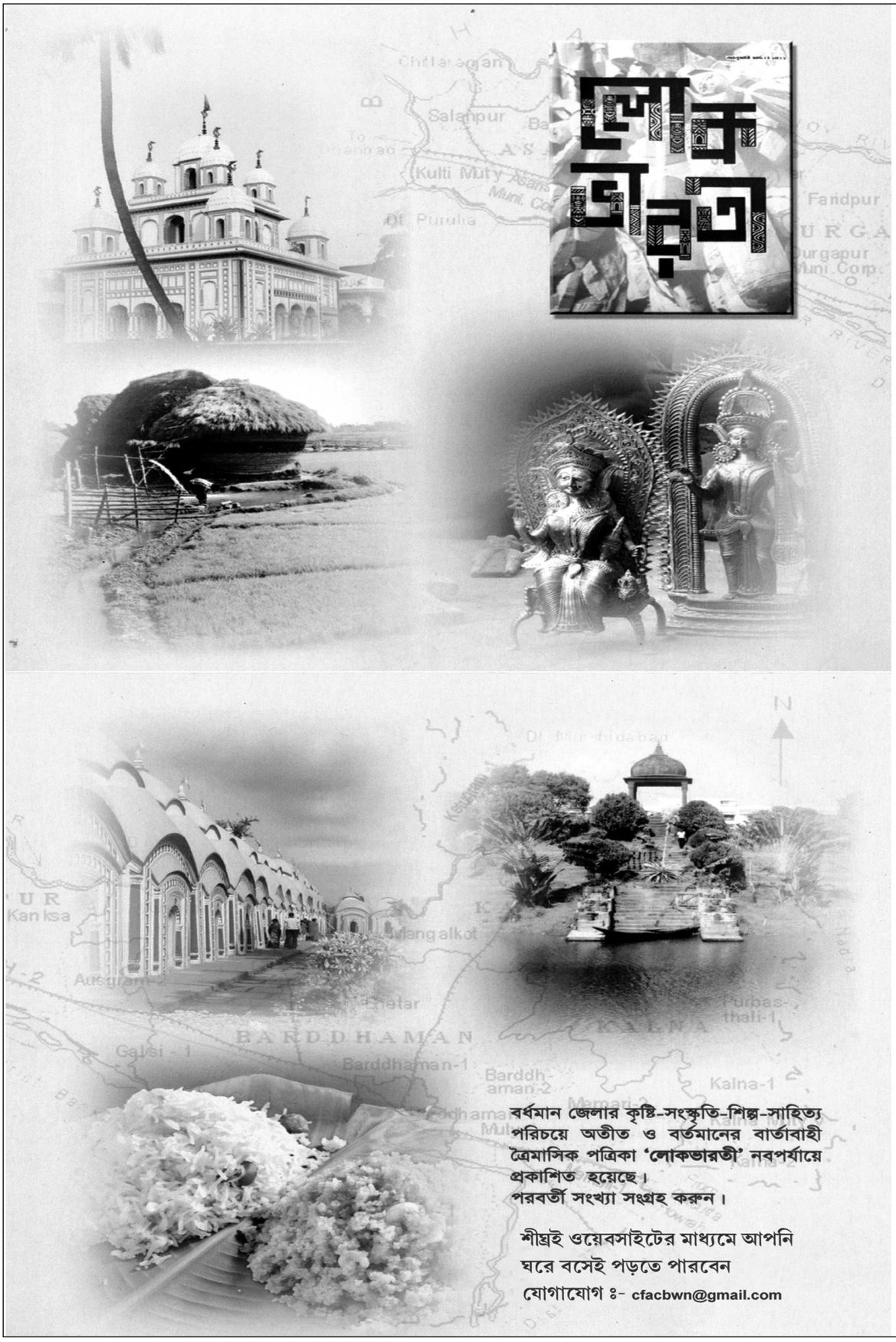
লোকভারতী
বর্ধমান জেলার কৃষ্টি-সংস্কৃতি-শিল্প-সাহিত্য পরিচয়ে অতীত ও বর্তমানের বার্তাবাহী ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'লোকভারতী' নবপর্যায়ে প্রকাশিত হয়েছে।
পরবর্তী সংখ্যা সংগ্রহ করুন।
শীঘ্রই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই পড়তে পারবেন
যোগাযোগ ঃ- cfacbwn@gmail.com

হঠাৎ দেখা

বিলাস চ্যাটার্জি

মানুষের জীবন এক সীমাবদ্ধ কক্ষপথে আবদ্ধ নয়। সীমিত সময়ে প্রতিটা মানুষই জীবনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে চায়। কেউ কবিতা ভালোবাসে, কেউ গান ভালোবাসে, কেউ ভালোবাসে লিখতে—এই সবের মধ্যেই ছন্দ থাকে, থাকে ভালোলাগা, থাকে বন্ধনহীন জীবনের স্বাদ। গান, কবিতা আমিও ভালোবাসি কিন্তু আমার মুক্ত শ্বাস নেওয়ার জায়গাটা একটু অন্যরকম।

আমি কথক। আমি ভ্রমণ পিপাসু। পরিবেশের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেওয়ার যে আনন্দ তা আমি বারবার অনুভব করি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে। শুধু প্রকৃতি নয়, নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা, তাদের জানা—চেনার মধ্যে দিয়েই 'ভ্রমণ' পূর্ণতা পায় আমার জীবনে। তেমনই এক ভ্রমণের গল্প শোনাব আপনাদের—ঠিক গল্প নয়, এক সত্যকে আপনাদের কাছে তুলে ধরব আমি।

সালটা ১৯৯৫। জুলাই মাস। নির্দিষ্ট তারিখ আজ আর মনে নেই। আমরা চারজনে গিয়েছিলাম লে-লাদাখ বেড়াতে। আমি, আমার বন্ধু প্রসেনজিৎ, প্রসেনজিতের স্ত্রী ও কোলেদা (রমাপ্রসাদ কোলে)। কাশ্মীর তখন উত্তপ্ত। সকল স্বর্গীয় সৌন্দর্য নিয়ে এক নরকে পরিণত হয়েছিল কাশ্মীর। উগ্রপন্থীদের খুন-খারাপি, এক চরম বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে কাশ্মীরবাসী দিন কাটাচ্ছে। পর্যটকশূন্য কাশ্মীর। লাদাখ অঞ্চলটি কাশ্মীরের অঙ্গ হলেও বিপর্যয়, বিশৃঙ্খলার ছায়া সেখানে ছিল না। তাই আমাদের লাদাখ ঘুরতে যাওয়া।

'লে' শহরে যাওয়ার দুটি পথ—একটি শ্রীনগর থেকে ও অপরটি মানালী থেকে। তৃতীয় একটি পথও ছিল—সেটা আকাশপথ, এরোপ্লেনে যাওয়া যায়। শ্রীনগর থেকে যাওয়া অসম্ভব, তাই আমরা মানালী থেকে সড়ক পথে 'লে' গেলাম। শান্ত এই অঞ্চলটিতে শ্রীনগরের অশান্তির কোনো প্রভাব নেই। প্রশাসনও তৎপর যেন কোনো অশান্তি এই শহরে প্রবেশ করতে না পারে—সেই ব্যাপারে। সেই কারণেই সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মানুষদের পথে ঘাটে থাকা নিষিদ্ধ। অবশ্য ঘোরাঘুরির ক্ষেত্রে পর্যটকদের উপর কোনো বিধিনিষেধ ছিল না। সন্ধ্যা নামার পর থেকে পরের দিন সকাল পর্যন্ত শহরটি সি.আর.পি.এফ.-এর দখলে চলে যায়। মোটামুটি শান্তি ও স্বস্তির মধ্যে দিয়েই আমাদের বেড়ানোটা শুরু হল।

আমারই শহর বর্ধমান-এর এক যুবক এয়ারফোর্সে কর্মরত। সেই সূত্রে 'লে' শহরে এয়ারপোর্টের কাছে তার সস্ত্রীক আবাসন। সে দুপুরে আমাদের হোটেলে এলো গল্প করতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল, গল্পের আর শেষ নেই। সন্ধ্যের আগেই ওদের দু-জনকে বাসে তুলে আমরা একটু ঘুমবো বলে ঠিক করেছিলাম। হঠাৎ-ই পিছন থেকে কেউ আমার পিঠে হাত দিয়ে ডাকছে মনে হতে ফিরে তাকাই। হ্যাঁ, একজন উর্দিপরা কর্মরত CRPF জওয়ান আমাকেই ডাকছে। পুলিশে ছুঁলে ১৮ ঘা, কিন্তু CRPF-এ ছুঁলে কত ঘা তা জানা না থাকায় ভয় যে একটু বেশিই পেলাম আজ তা আর স্বীকার করতে লজ্জা নেই। 'কিছু বলবেন?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম। একটু

দূরে দাঁড়িয়ে থাকা একদল জওয়ানদের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে সে জানালো—'বুলাতা হ্যায়।' দুরু দুরু বুকে মুখে হাসির রেখা টেনে স্মার্টলি ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কাছে যেতেই ওদের মধ্যে থেকে একজন পরিষ্কার বাংলায় জানতে চাইলো—'আপনারা কি বাঙালি?' এক দীর্ঘশ্বাস অনেকক্ষণ ধরে বুকে আটকে ছিল, 'হ্যাঁ'—উত্তরটা দিয়ে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলাম। শুরু হল পরিচয় পর্ব।

এই পরিচয় শুধু মুখে নয়, চা সিঙ্গাড়া সহ। গল্প চলল অনেকক্ষণ। যতই রুক্ষ মেজাজে রাস্তায় নিরাপত্তার কাজে নিযুক্ত থাকুক না কেন, অন্তরের নরম বাঙালিয়ানা যাবে কোথায়। ২২-২৩ বছর বয়সের যুবক। নাম—অতনু রায়। নিবাস—চব্বিশ পরগণার কোনো এক প্রত্যন্ত গ্রামে। মাস চার-পাঁচ হল 'লে'-তে পোস্টিং। আগে ছিল শ্রীনগরে। সেখান থেকেই এখানে আসা। শ্রীনগরের এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ২৪ ঘণ্টা A.K.47 নিয়ে অ্যাটেনশন পজিশনে থাকা, কী কষ্টের জীবন কেটেছে—গত দু বছরের সেই কাহিনি উঠে এলো বাঙালির চায়ের আড্ডায়—সেই স্বল্প সময়ের মধ্যেই। আমাদের হোটেলে ফিরতে হবে। তাই গল্প শেষ করে এগিয়ে চলি। অতনু তার সঙ্গীদের নিয়ে হোটেল পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। হোটেলে ছিল আমাদের বন্ধু প্রসেনজিৎ ও তার স্ত্রী। হোটেলে পৌঁছে আবার গল্প শুরু করল। রাত তখন নটা। আগামীকাল ওর ব্যারাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিল।

পরদিন প্রাতঃরাশ শেষ করেই লোকাল কিছু বৌদ্ধ মন্দির সে, থিকসে, হেমিজ দেখার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লাম। সারাদিনের জার্নি। পরদিনই ভোরের বাসে মানালী ফেরার টিকিট কাটা আছে আমাদের। প্রকৃতির অপরূপ শোভা আমাদের মনটাকে এমনভাবে বেষ্টন করে ছিল যে অতনুর কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে ম্যানেজার-এর কাছে থেকে জানতে পারলাম অতনু অনেকবার খুঁজতে এসেছিল আমাদের। তার সঙ্গে তিনি এও জানালেন যে হোটেলে এত CRPF-এর আনাগোনাতে অন্য বোর্ডাররা ভয় পাচ্ছে, এই বিষয়টা যেন আমরা একটু দেখি। 'ওদের অবশ্যই বলব'—এই আশ্বাস দিয়ে নিজেদের রুমে পোষাক বদল করতে চলে যাই আমরা। তখনই অতনু উপস্থিত হল তার দলবল নিয়ে। আমাদের নিতে এসেছে।

বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় আমাদের শহরের মিলিটারি ক্যাম্প হয়েছিল বেশ কয়েকটা জায়গায়, ছিলও অনেকদিন। দেখেছিলাম ওদের দৈনন্দিন জীবন কাছ থেকে। কিন্তু CRPF-এর ক্যাম্প সম্পর্কে কিছুই জানি না। তাই প্রসেনজিতের বৌকে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে কিনা ভাবছিলাম। অতনু একপ্রকার সবাইকে তুলে নিয়ে গেল ব্যারাকে। বিরাট পার্টির আয়োজন করেছে অতনু। আমরা ছাড়াও মেজরসহ বাইশ জন নিমন্ত্রিত এই পার্টিতে। অতনু তার বন্ধুদের জানিয়েছে যে আমরা ওর নিকট আত্মীয়। তাই আমাদের জন্য এই পার্টির আয়োজন।

চা বিস্কুট দিয়ে শুরু হল আড্ডা। অতনু ওর বাড়ির অ্যালবাম থেকে পরিবারের সকল সদস্যর ছবি দেখালো। বৌদিকে দেখালো ওর হবুস্ত্রীর ছবি। আর মাত্র একবছর পর ওর পোস্টিং হবে সমতলে। তখন ও বিয়ে করবে। এখানে মানে 'লে'-তে যদিও আপাত শান্তি বিরাজ করছে কিন্তু সবসময় ভয় হয় যদি আবার কখনো শ্রীনগরে পাঠায় তাকে। ১৯৯৫ সালে 'লে' শহর, শহর ছিল না। কোনো সবুজ ফসল প্রায় পাওয়াই যেত না। গত চারদিন আমরা শহরে থাকলেও খাওয়ার বেশ সমস্যা ছিল। কিন্তু ব্যারাকে সব্জির কোনো অভাব নেই। চা-এর পর এল কাবাব ও স্যালাড। শশা, পেঁয়াজ, টম্যাটো, লঙ্কা, লেবুসহ। তার সঙ্গে এল দামি মদ। অতনুর পার্টিতে মেজর সাহেব আমাদের জন্য বিশেষ এই ব্যবস্থা করেছেন। বৌদি আর প্রসেনকে খাওয়া-দাওয়ার পর হোটেলে পৌঁছিয়ে দিতে বলে আমরা দুজনে ওঁদের সঙ্গ দিলাম। রাত নটা। সবেমাত্র আমরা উঠব উঠব ভাবছি ঠিক তখনই ভাত, রুটি, মাংস—হাজির। উপেক্ষা করা অসম্ভব। তাই হাল্কা খেয়ে বিদায় নিলাম ব্যারাক থেকে। আমাদের দুজনকে হোটেলে পৌঁছাতে এল জনা দশেক ফৌজি। হোটেলের গেটের কাছে পৌঁছে অতনুকে জানতে চাইলাম—'তুমি খুশি তো?' আবেগে আপ্লুত হয়ে সে আমাদের জানালো—'এখানের প্রতিটি ফৌজি-ই বাড়ির লোকেদের বেড়াতে আসার আনন্দে পার্টি দিয়েছে। অনেকবার বলেও আমার বাড়ির লোক কখনো আসে নি এখানে। কিন্তু আজ আপনাদের পেয়ে কী যে আনন্দ পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়।' বাঙালি হিসেবে বলতে পারি—শুধু রক্তের সম্পর্কই সম্পর্ক নয়। আমরা বাঙালিরা বাংলার বাইরে থাকলে সকলেই সকলের আপন হয়ে উঠি। হতে বাধ্য। তা না হলে আমাদের বাঙালি সংস্কৃতিই হারিয়ে যেত। সভ্যতার সংকট দেখা দিত, তাই না?'

ওর দুচোখ তখন ছলছল করছে। আনন্দেই নিশ্চয়ই, কিংবা কোনো অব্যক্ত যন্ত্রণায়—জানি না। ওকে বুকে টেনে একটু আদর করে বিদায় দিলাম। পরদিন সকালের বাসে যথারীতি বিদায় জানাতে ওরা জনা দশেক হাজির ছিল। আমাদের বাস ছাড়তেই অতনু কেমন বিমর্ষ হয়ে মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা তাকিয়ে রইলাম, যতক্ষণ দেখা যায় ওদের, কিছুক্ষণ পরে ক্রমশ আমারও দুচোখ ঝাপসা হয়ে এল। দূরত্বের কারণে নয়—কখন যে আমার চোখের দুটো পাতা জলে ভিজে গেছে বুঝতে পারি নি। তবে কি অতনু আমার নিজের কেউ? যে এই দুর্গম অঞ্চলে চাকরি সূত্রে এসেছে?

আজও অতনুর বলা কথাটাই বারবার আমার মনে পড়ে—'শুধু কি রক্তের সম্পর্কই সম্পর্ক?'

মানালী হয়ে বর্ধমান ফিরতে কয়েকটা দিন কেটে গেছে। বেড়ানোর আনন্দ, প্রকৃতির সৌন্দর্য—বারবার কৌতূহলীদের বলেছি, স্মৃতি রোমন্থনও করেছি। ভুলে গেছি অতনুকে। সে সময় মোবাইল ছিল না, টেলিফোনও ছিল না বাড়িতে—ঠিকানাটাও নেওয়া হয়নি তার। তাই যোগাযোগ শূন্য হওয়ায় স্মৃতি থেকেও হারিয়ে গেছে অতনু।

'লে' থেকে ফেরার কয়েকমাস পর সম্ভবত অক্টোবর মাসে একটি খবর পড়লাম সকালের কাগজে। —জম্মু-কাশ্মীরের উধমপুরে জঙ্গিদের সঙ্গে CRPF-এর বড় ধরনের এক সংঘর্ষে ৩ জন জঙ্গী নিহত হয়েছে। একজন CRPF জওয়ানও শহিদ হয়েছে এই লড়াই-এর ময়দানে। সে বাঙালি, ২৪ পরগণার বাসিন্দা...। থমকে গেলাম খবরের কাগজটি পড়তে পড়তে। আর বিস্তারিত (যা ভিতরের পাতায় ছিল) খবর না পড়ে বেরিয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে।

বারবার ভুলতে চেয়েছি ফৌজি উগ্রপন্থীদের সংঘর্ষের এই ভয়াবহ মর্মান্তিক ঘটনাটি। কিন্তু আজও তা আমার স্মৃতির মণিকোঠায় স্থির হয়ে রয়েছে। সত্য-টা কী তাও জানা হয়ে ওঠে নি আজ পর্যন্ত। কাশ্মীরের বুকে কে সে বাঙালি শহিদ?

অণুগল্প

ধোলাই

তপোময় ঘোষ

দরদি পঞ্চায়েতকর্মী কানাই দাসের গায়ে মাথায় এঁটো ডাবের জল ঢেলে দিয়েছিল ওরা। ওরা মানে গগন পালের দলের লোকজন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী গগন পাল যখন প্রধান হিসাবে শপথ গ্রহণ করছিল, তখন পঞ্চায়েত-চত্বর জুড়ে হৈ-হুল্লোড় তাণ্ডব করছিল অত্যুৎসাহী দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। তাদের কেউ কেউ এ কাণ্ড করেছিল। বেচারা বুড়ো কানাই দাস এঁটো জলে জবজবে।

প্রধান গগন পাল পাত্তা না দিলেও পি.ডি.ও. সাহেব ব্যাপারটা জেনে খোঁজ নিলেন। কে এসব করলেন? করিৎকর্মা সমর্থকরা এসে জানালো, আমরাই স্যার। ও কে জানেন? ও ব্যাটা পাকা বদ। বদের ধাড়ি। ঠিক করেছি।

—তা ডাবের জলে কেন?

—কী করবো, আর তো গঙ্গাজল ছিল না। আপনি তো দেখলেন, আমরা গঙ্গাজলে ঘরের টেবিল-চেয়ার মেঝে সব ধুলাম। আলমারি ফাইলে গঙ্গাজল ছেটালাম। তবে শুদ্ধ। শালাদের চৌত্রিশ বছরের পাঁক জমে ছিল।

—ওই লোকটার মাথায় গায়েও?

—হ্যাঁ, ওই তো এ অফিসের একজন। কতদিন আছে জানেন!

—কিন্তু এভাবে ...

—বেশ করেছি। বেশি ট্যাণ্ডাই ম্যাণ্ডাই করলে আপনাকেও ...দেখবেন? কই রে, কে আছিস? আর আধ-খাওয়া ডাব আছে? ...পাশে পুলিস ছিল। তারা পি.ডি.ও. সাহেবকে দেখে করুণা করে হাসছিল।

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

গ্রামীণ উন্নয়নে জনগণের সহযোগিতা কামনা করি।

পাটুলি গ্রাম পঞ্চায়েত

নয়ন হালদার
উপপ্রধান

সুভাষচন্দ্র দাশ
প্রধান

Sl. No. 70

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সমবায় আন্দোলন দীর্ঘজীবী হোক

সমবায় হোক গরিবের হাতিয়ার

কমলনগর এস.কে.ইউ.এস. লি.

মাজিদা, বর্ধমান

Sl. No. 69

With Best Compliments of

Magra Brick Field & Co.

Vill. Denha Magra
P.O. Ghosh, Dist. Burdwan
Phone : (0342) 2250639

Sl. No. 99

With Best Compliments of

Fazlul Haque

127, B.C. Road
Barabazar, Burdwan

Sl. No. 73

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কামাক্ষা অ্যাগ্রো প্রোডাক্ট প্রা. লি.

গর্গেশ্বর, পাহাড়হাটী, বর্ধমান

Sl. No. 12

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কুবাজপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কুবাজপুর, ব্লক : ভাতাড়, বর্ধমান
রেজি. নং ৩৪১২/২০-৮-৫৯

আমাদের পরিষেবা সমূহ—

১. স্বল্প সুদে সভ্যগণের মধ্যে কি.সি.সি. ঋণ প্রদান।
২. রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ঔষধের পাইকারি এবং খুচরা ব্যবসা।
৩. আমানত সংগ্রহ এবং আমানতের উপর স্বল্প সুদে ঋণ দাদন।
৪. স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে ঋণ দাদন।

অভয়াচরণ মুখার্জী
ম্যানেজার

Sl. No. 4

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

প্রতিমা সুইটস

উৎকৃষ্ট মানের মিষ্টান্নের সেরা প্রতিষ্ঠান

বেড়মোড় (কালীতলা), বর্ধমান

Sl. No. 3

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

হামুনপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

গ্রাম : হামুনপুর, পোঃ বোহার, বর্ধমান
রেজি. নং : ২৮ তারিখ : ২১-৫-১৯২৫

গ্রামোন্নয়নের হাতিয়ার গ্রামীণ সমবায়।
সঞ্চয় প্রকল্পের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
আমাদের দাবি : **এলাকার টাকা এলাকায় রাখুন।**

এছাড়া রাসায়নিক সারের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান
বিক্রয় কেন্দ্র : রায়বাটী বাজার

জহুর আলি সেখ	**স্বরূপ মিত্র**	**দীনবন্ধু হালদার**
সভাপতি	সম্পাদক	ম্যানেজার

Sl. No. 13

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

এই বেশ ভালো আছি

শাস্ত্রী স্মৃতি সংঘ

রাষ্ট্রীয় সম্মানে ভূষিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা

নাদনঘাট, বর্ধমান

Sl. No. 36

With Best Compliments of

মানকর গ্রাম পঞ্চায়েত

গলসি-১ পঞ্চায়েত সমিতি
পোঃ মানকর, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪৩) ২৫১৭৩০৯

মানকর গ্রাম পঞ্চায়েত আগামী দিনে সর্বশিক্ষা, সার্বিক স্বাস্থ্যবিধান ও স্বয়ম্ভরতার কর্মসূচিগুলিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার অঙ্গীকার করছে।

নীলেশ্বর গোস্বামী
উপপ্রধান

শুক্লা ভট্টাচার্য
প্রধান

Sl. No. 21

With Best Compliments of

হমারে ইঁহা গোল্ড টু গোল্ড
ফুল রিটার্ন মিলতে হ্যায়।
২২ ক্যারেট গোল্ড বা শুদ্ধ চাঁদি কে লিয়ে

Dukhilal Jewellers

Moonlight Market
Bastin Bazar, Asansol-1

Proprietor : **Dhiraj Barman**

Sl. No. 15

With Best Compliments of

Biswajit Bhattacharya

Agent : LICI, Branch-II

16Y, Bidhanpalli, Asansol
Dist. Burdwan

Sl. No. 16

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কালেশ্বর এস.কে.ইউ.এস. লিমিটেড

রেজি. নং : ৫৪, তারিখ : ১৪-০৪-৩০
পোঃ কুচুট, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৭১৯২৭০

আমাদের ব্যবসা

ব্যাঙ্কিং, কে.ভি.পি. এবং টি.ডি. সার্টিফিকেট বন্ধক রেখে ঋণ। কে.সি.সি. এম.টি. ঋণ দাদন, সার কীটনাশক ও বন্ধকী ব্যবসা। এছাড়াও ১৮টি মিনির জল সরবরাহ করা হয়।

অশোককুমার মণ্ডল সভাপতি | **সুনীলকুমার নন্দী** সহসভাপতি | **বিপিন রায়চৌধুরী** সম্পাদক

Sl. No. 14

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মেড়তলা গ্রাম পঞ্চায়েত

পূর্বস্থলী-২, বর্ধমান

পিছিয়ে পড়া দরিদ্র জনগণের পঞ্চায়েতর মাধ্যমে পরিষেবা ও আর্থিক, সামাজিক উন্নয়ন ও সকল মানুষকে—ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পঞ্চায়েতমুখী হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা আমাদের মূল লক্ষ্য। আমাদের এই পঞ্চায়েতে সকল মানুষকে নিয়ে সমন্বয় রেখে কাজ করার জন্য আমরা সর্বদা চেষ্টা চালিয়ে যাব যাতে সমস্ত মানুষ অনুভব করেন যেন এই পঞ্চায়েত তাঁদেরই।

ধর্মেন্দু ঘরামী
প্রধান

Sl. No. 72

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

চক্রবর্তী ট্রাভেলস

প্রোঃ অরিন্দম চক্রবর্তী
সুলন্টু, পারুলিয়া, পূর্বস্থলী

এখানে ভিডিও কোচ, পুশব্যাক লাক্সারি বাসে সারা ভারত ভ্রমণ ও যে-কোনো বিবাহ এবং ভ্রমণে বাস ভাড়া দেওয়া হয়।

যোগাযোগ
মোবাইল : ৯৭৩২১৭৪২২৯, ৯৩৩৩৮৮২৫২৬

Sl. No. 68

With Best Compliments of

দীর্ঘ ২০ বছর 'ভারতীয় জীবনবিমা নিগম' এবং ৬ বছর 'ভিবজিওর'-এর মাধ্যমে মানুষের সেবায় নিযুক্ত

CHARANDAS KONER

Advisor of :
LICI-BBO & Vibgyor Group

Vill. P.O. : Sadya. P.S. & Dist. Burdwan-713407
Contact : 09475375790

Sl. No. 79

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

চণ্ডীমাতা হিমঘর

এখানে কৃষকের আলু যত্নসহকারে সংরক্ষণ করা হয়।

আঝাপুর, বর্ধমান

Sl. No. 134

With Best Compliments of

M/s. R.K. SAMANTA & CO.

GOVT. CONTRACTOR

Prop. Somnath Samanta
Putunda, Saktigarh, Burdwan

Sl. No. 76

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

দেনুড় গ্রাম পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে
সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতা কামনা করি।

পোঃ দেনুড়, ব্লক : মন্তেশ্বর, বর্ধমান
ফোন : ০৩৪২-২৭৫৫৪৬৫

কৃষ্ণা ঘোষ
উপ-প্রধান

বিধান মাজি
প্রধান

Sl. No. 150

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

যামিনী রাইস মিল

উন্নত মানের চাউল উৎপাদক

কাষ্ঠকুড়ুম্বা, বর্ধমান

Sl. No. 78

With Best Compliments of

SAHANUI S.K.U.S. LTD.

F A C I L I T I E S

Loan, Banking, Cultivation, Irrigation, Marketing (Seed, Fertilizer, Pesticies, Agricultural Implements, Indane Gas, Self Help Group). We offer 0.5% higher rate interest on all kinds of deposit.

Sudeb Koley
Chairman

Durgadas Soren
Secretary

Sl. No. 100

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

তিরুপতি কোল্ড স্টোরেজ প্রাইভেট লিমিটেড

বিষ্ণুপুর, রসুলপুর, বর্ধমান

Sl. No. 104

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

শশীনাড়া এস.কে.ইউ.এস. লি.

শশীনাড়া, বর্ধমান

এখানে ব্যাঙ্ক পরিষেবা, কৃষিঋণ, গ্যাস পরিষেবা কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে।

কাজের সময়

সকাল ৭টা থেকে ১২টা ।। বিকাল ৩টা থেকে ৫টা

তাপস ব্যানার্জী
সভাপতি

দেবপ্রসাদ গুঁই
সম্পাদক

Sl. No. 101

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

চকদিঘী অঞ্চল কৃষি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

চকদিঘী, বর্ধমান, ফোন : ০৩৪৫১-২৮৬৬০৫

রেজি. নং ২৪৭১, তাং : ২৪-১১-১৯৫৮

সর্বোচ্চ ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত চাষিবন্ধুদের স্বল্প সুদে ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমানে সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা ৩৫৯। সমবায়ের মাধ্যমে নির্ধারিত মূল্যে কৃষকদের সার, খইল, কীটনাশক সরবরাহ করা হয়। সমিতিতে সেভিংস, ফিক্সড ও টাইম ডিপোজিটের ব্যবস্থা আছে। যে-কোনো বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক অপেক্ষা বেশি সুদের সুযোগ দেওয়া হয়। এন.এস.সি./কে.বি.পি. বন্ধক রেখে ঋণ দেওয়া হয়।

গৌরাঙ্গ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজার

Sl. No. 133

With Best Compliments of

APARESH DEY

GOVT. CONTRACTOR

Monteswar, Burdwan
Contact : 9434576358

Sl. No. 93

With Best Compliments of

SUVENDU ROY

GOVT. CONTRACTOR

Monteswar, Burdwan
Contact : 9434576360

Sl. No. 94

With Best Compliments of

B.K. INDUSTRIES

Manufacturer of Automatic Rice Mill and Installation
Our Speciality to repair all above machineries

Bhotar, Katwa Road
P.O. & Dist. Burdwan, PIN : 713101

Khokon Das, Bapi Das
M : 9732076115, 9732939411
Email :bkindustries.ricemachinery2012@gmail.com
website : www.bkindustries.org

Sl. No. 82

With Best Compliments of

RENUKA PLY & PAINTS

Golapbag More, Amtala
Burdwan-713104, West Bengal
E-mail : subhajit.dolui@gmail.com

Abhijit Dolui
M : 9932494929, 9333332229

Sl. No. 80

With Best Compliments of

DAUDAR RAHAMAN MIA

Govt. Contractor and General Order Supplier

Vill. Masdanga, P.O. Kaigram, Dist. Burdwan
Mobile : 9732219419

Sl. No. 92

With Best Compliments of

Sethia Jain & Co. (P) Ltd.

Debipur, Memari
Dist. Burdwan
Phone : (0342) 2263270

Sl. No. 95

With Best Compliments of

Mitra Construction
Mitra Commercial Pvt. Ltd.
Mitra Earthmovers Pvt. Ltd.

Civil & Mechanical Contractor
Contact for Crane, Dumper & all types of
Heavy Earthmover Equipments.

Shyamal Mitra
Director
Cell : 94347 43122, 97347 42882

ASP Main Gate, Durgapur-713208, Dist. Burdwan
Tel. (0343) 2545709, Fax : 0343-254-4983
E-mail : mcpldgp8@gmail.com

Sl. No. 90

With Best Compliments of

M/s Burdwan Spun Pipe Industries

Manufactorer of RCC Spun Pipe, Collars & Spigot Type

CONCTACT :
Natun Pally, P.O. & Dist. Burdwan
Phone : 0342-2662232 (Fax), 2544640
M : 9734253041, 9434199510

OFFICE AND FACTORY
Vill. & P.O. Hossainpur,
Via. Bhatar, Via. Maldanga, Burdwan
Ph : 0342-2324644, 9434002427, 9434387218

Sl. No. 91

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মহাপ্রভু ট্রাভেলস

এখানে লাক্সারি ভিডিও কোচ ভাড়া পাওয়া যায়

যোগাযোগ

৯৫৯৩৫৫৫১২১, ৯৮৩২১৭১৪২৯

Sl. No. 83

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

J. KUNDU

Denha, Memari, Burdwan

Sl. No. 96

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত
প্রাপ্যবরাণ নিবোধত

স্বামীজির এই সার্থকবাণী সকলকে জাগ্রত করুক।

জনৈক শুভানুধ্যায়ী

Sl. No. 88

With Best Compliments of

BRIGHT CONSTRUCTION

Civil, Mechanical Contractor
and General Order Supplier

HEAD OFFICE
14/40, Secondary Road, Durgapur-713204, Burdwan
Mobile : 9434592277

Sl. No. 89

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

নিউ বেঙ্গল অ্যাগ্রো ইমপ্লিমেন্টস

কৃষ্ণবাজার, জি টি রোড, মেমারি, বর্ধমান

ফোন : ০৩৪২-২২৬২৩৪৪, ৯৪৩৪০০৪৯২০

ফ্যাক্টরি : কালসী, জি টি রোড, পোঃ চৌটখণ্ড

থানা : মেমারি, জেলা : বর্ধমান

এখানে ডবল ও সিঙ্গল গিয়ার রোটাভেটার প্রস্তুত করা হয়।

এছাড়া আমাদের নবতম আবিষ্কার—

১. আলু বপন যন্ত্র, ২. আলু তোলা যন্ত্র

৩. ভুট্টা ঝাড়াই যন্ত্র, ৪. হাইড্রোলিক ট্রেলার ইত্যাদি

Sl. No. 106

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

পঞ্চায়েতের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নকে অব্যাহত রাখতে
সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করি

গোপগন্তার-১ গ্রাম পঞ্চায়েত

ক্ষুদিরাম কোঁড়া
উপপ্রধান

শম্পা ক্ষেত্রপাল
প্রধান

Sl. No. 105

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

কেন্না সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

কেন্না, বর্ধমান

শ্যামাপদ ক্ষেত্রপাল
সভাপতি

স্বপনকুমার মল্লিক
ম্যানেজার

মোহিত যশ
সম্পাদক

Sl. No. 102

With Best Compliments of

দেউলিয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

দেউলিয়া, আঝাপুর, থানা-মেমারি, বর্ধমান

রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ঔষধ বিক্রেতা।
ব্যাঙ্ক পরিষেবাও আছে।

সেখ আব্দুল আজিম
সভাপতি

আব্দুল মজিদ মল্লিক
ম্যানেজার

আব্দুল আলিম মণ্ডল
সম্পাদক

Sl. No. 103

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মহাশক্তি কোল্ড স্টোরেজ প্রা. লি.

শুঁড়েকালনা, জামালপুর, বর্ধমান

আলু সংরক্ষণের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 56

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

তুহিন নলকূপ সেন্টার

সৌজন্যে

তুহিন সেখ

Sl. No. 57

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভজটিল বন্ধ।

—রবীন্দ্রনাথ

মহেশ্বরী মাল্টিপল
মিলস প্রাইভেট লিমিটেড

হাটগাছা মোড় (আঙ্গরাডাঙা)

গ্রাম : শুশনা, পোঃ তারা শুশনা, জেলা : বর্ধমান

**অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎকৃষ্ট মানের
কাঁকরবিহীন পারবয়েল্ড চাল প্রস্তুতকারক**

Sl. No. 61

With Best Compliments of

Asanpur S.K.U.S.

Vill. Asanpur, Dist. Burdwan

Sl. No. 62

With Best Compliments of

Dalurbandh Colliery Employees
Coperative Credit Society Ltd.

Krityananda Kumar
Chairman

Sukumar Mishra
Secretary

Sl. No. 107

With Best Compliments of

SUBHASHREE RICE MILL
STONELESS RICE

Paraj Station Road, Kolkol More
Pursha, Burdwan, PIN : 713406

Sl. No. 111

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

দেশবন্ধু রাইস মিল
উন্নত মানের চালের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ভাষাপুল, বর্ধমান

Sl. No. 109

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

মা কালী রাইস মিল
পারাজ স্টেশন মোড়, গলসী, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯৪৩৪১৫৬৭০৩, ৯১৫৩০০১৭৫০

এখানে উৎকৃষ্ট মানের ভাত ও মুড়ির চাল পাওয়া যায়

Sl. No. 108

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

মা তারা ইটভাটা

পগমিলের উন্নত মানের ইট ব্যবহার করুন

সুলুন্টু, পারুলিয়া, বর্ধমান

Sl. No. 66

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

আলু সম্রাট

প্রফুল্ল কোল্ড স্টোরেজ

সবারে করে আহ্বান

প্রফুল্ল কোল্ড স্টোরেজ, চকদিঘি, বর্ধমান

Sl. No. 59

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

জীবিকা রাইস মিল

বাদল রাইস সুপার পারবয়েলড চাউল
কাঁকড় বিহীন
J.R.M.

পারাজ স্টেশন রোড, গলসী, বর্ধমান
যোগাযোগ : ৯৪৭৪৭৮৬৪২৭
মিল : (০৩৪২) ২৪৫৪৯৭১

Sl. No. 110

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

পিপলন সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ১৪কে.টি. তারিখ : ২৯/৩/৬৩
গ্রাম ও পোঃ পিপলন, জেলা : বর্ধমান

সমিতির কার্যাবলী

১. স্বল্পমেয়াদি, মধ্যমেয়াদী, মৎস্যচাষ ঋণ দাদন।
২. ৮৩টি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সামিল।
৩. কৃষি উপকরণ—সার, বীজ, কীটনাশক ও ঔষধ সরবরাহ।
৪. চেক ভঙানো সহ সমস্ত প্রকার ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান।
৫. এলাকার বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ।

হাজু ঘোষ সভাপতি | **গোপাল দত্ত** ম্যানেজার | **কার্তিকচন্দ্র হাজারী** সম্পাদক

Sl. No. 65

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

কুলুট সমবায়
কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি.

রেজি. নং : ৬১৫, তারিখ : ১২/০৪/১৯২০

প্রধান কার্যালয় : গ্রাম ও পোঃ কুলুট, ফোন (০৩৪২) ২৭৫০৫৫১
শাখা অফিস : (ব্যাঙ্কিং) কুসুমগ্রাম সুপার মার্কেট দ্বিতল, ফোন : (০৩৪২) ২৭৫০৫৯৫।। শাখা অফিস : (সার ও কীটনাশক) চুয়াডাঙ্গা, পোঃ পুটশুড়ি, ফোন : (০৩৪২) ২৭৫৫৩৯৬

আমাদের কার্যাবলী

১. সভ্যদের কেসিসি, এম.টি ঋণ প্রদান। ২. গ্রাহকের জন্য ব্যাঙ্কিং পরিষেবা (সেভিংস, রেকারিং, টাইম ডিপোজিট)। ৩. ন্যায্য মূল্যে খুচরা সার ও কীটনাশক বিক্রয়। ৪. ৪৮টি সাবমার্শিবল পাম্প দ্বারা এলাকায় কৃষিকাজ, জলসেচ সরবরাহ ৫. ট্রাক্টর ও পাওয়ার টিলারের মাধ্যমে কৃষি ও অন্যান্য কাজে সহায়তা করা। ৬. আর্থিক দিক থেকে পিছিয়েপড়া মানুষদের নিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের মাধ্যমে আর্থিক সহায়তা প্রদান।

সেখ মহম্মদ আলি সভাপতি | **হবিবর রহমান মণ্ডল** ম্যানেজার | **সেখ সরিফউদ্দিন আহাম্মদ** সম্পাদক

Sl. No. 60

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

নিউ মা মনসা ইন্ডাস্ট্রিজ

পাওয়ার লুম লুঙ্গি প্রস্তুতকারক

ভাণ্ডারটিকুরি, পূর্বস্থলী, বর্ধমান

Sl. No. 67

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

সুবর্ণ রাইস মিল

খেতুড়া, গলসী, বর্ধমান
ফোন : (০৩৪২) ২৪৫১৩২৬, ২৪৫১৩২৭

উৎকৃষ্ট মানের মুড়ির চাউল বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Sl. No. 38

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

আপনার স্বপ্নের ইমারত গড়তে ব্যবহার করুন
D.B.F.
মার্কা পগমিল ইট

দামোদর ইটভাটা

শম্ভুপুর, চক্ষণজাদী, বর্ধমান
ফোন : ৯৭৩২১৬১২০৬, ৮০০১৭৬৯১৫০, ৯৪৭৬২৩৬১৯৪

Sl. No. 54

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

শান্তি ব্রিক ফিল্ড

শম্ভুপুর, চক্ষণজাদী, জামালপুর, বর্ধমান

এখানে উন্নত মানের 'পকমন' মার্কা ইট সুলভ মূল্যে সরবরাহ করা হয়।

শান্তি দাঁ

Sl. No. 55

With Best Compliments of

BABA KALU RAY HEEMGHAR PVT. LTD.

Vill. & P.O. Jaragram, Dist. Burdwan
Phone : 03213-258556

Sl. No. 58

শারদোৎসবে এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা ও সন্ত্রাসমুক্ত পরিবেশ গড়ার লক্ষ্যে
সকলকে জানাই হার্দিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর স্বয়ম্ভরতা কর্মসূচির সার্বিক রূপায়ণে ভাল্কী গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আসুন আমরা এলাকার প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার ব্যবহার করে নির্মল গ্রাম গড়ে তুলি এবং সেই সাথে ধামসা মাদল ও আড়বাঁশির সুরে এলাকায় সুস্থ জীবনবোধকে জাগ্রত করতে সুস্থ লোকসংস্কৃতির বাতাবরণ গড়ে তুলি।

ভাল্কি গ্রাম পঞ্চায়েত

গণেশ আঁকুড়ে
উপপ্রধান

সুকুমার বাউরি
প্রধান

Sl. No. 141

With best compliments of

Sl. No. 44

With Best Compliments of

Radhakrishna Agro Products

A UNIT OF RICE MILLING PROJECT

Vill & P.O. : Belari, Dist. Burdwan, W.B.
Mobile : 7797278672, 7797278671

Our Brandname of Rice

'RADHASHREE RICE'

Sl. No. 142

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েত

পোঃ মালডাঙ্গা, বর্ধমান
ফোন : ২৭৫০৫৮৭

কাবলু মণ্ডল
উপপ্রধান

টুম্পা মণ্ডল
প্রধান

সুনীল মণ্ডল
নির্বাহী সহায়ক

বাসুদেব দুর্লভ
সচিব

Sl. No. 64

শারদীয়া ও ইদুজ্জোহায়
প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

ইউনাইটেড অ্যাগ্রো প্রাঃ লিঃ

গলসী, বর্ধমান
ফোন : (০৩৪২) ২৪৫১৩৫০, ২৪৫১৩৫১

Sl. No. 37

With Best Compliments of

BHUMI KONNA BRAND

High Quality Perboild Rice

Phone : 9732142501, 8926371199

Sl. No. 51

With Best Compliments of

Narayani Rice Mill (P.) Ltd.

Paraj, Galsi, Dist. Burdwan
Mobile : 9332082128

Sl. No. 39

With Best Compliments of

Mukesh Chowdhury

LABOUR SUPPLIER

Durgapur-11

Sl. No. 129

শারদ শুভেচ্ছা জানাই

আসানপুর দুগ্ধ উৎপাদক
সমবায় সমিতি লি.

আসানপুর, মন্তেশ্বর, বর্ধমান

সমবায় ঐক্য জিন্দাবাদ।
সততাই আমাদের মূলধন।

এখানে সমস্ত প্রকার গোখাদ্য ও পশু চিকিৎসার
সমস্ত রকম ঔষধ পাওয়া যায়।

শিশির ঘোষ
সভাপতি

প্রকাশ ঘোষ
সম্পাদক

Sl. No. 63

With Best Compliments of

A Well Wisher

SRMB

Sl. No. 138

With best compliments of

M/S APARAJITA ENTERPRISE

***Specialist in* : Binding / Loading & Gasfire**

Deshbandhu Nagar Colony
C/o. NITAI HALDER
Sagarbhanga, Durgapur-713221
Mobile No. 8926419562, 9932835643

Sl. No. 125

With best compliments of

PRAGATI CORPORATION

City Centre, Durgapur-713216
Dist. Burdwan

Sl. No. 139

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

শুভঙ্কর রাইস মিল

গ্রাম : ভিড়সিন, বুদবুদ, বর্ধমান

EXPORT QUALITY SUPER FINE SILKY SORTEX RICE

Sl. No. 19

With Best Compliments of

Sree Bishnu Rice Mill

Mankar, Burdwan
Contact No. 09153374614, 09153343945

Export Quality Super Fine Silky Sortex Rice

Our Brands

NARAYAN BHOG
NARAYAN BHOG GOLD
ANMOL RICE
CHIEF & BEST

Sl. No. 20

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

আদি তারামা বীজ ভাণ্ডার

প্রোঃ নারায়ণ বিশ্বাস (নাড়ু)
এখানে কীটনাশক, সব্জিবীজ ও চারা পাওয়া যায়।

গুসকরা হাটতলা, বর্ধমান
ফোন : ০৩৪৫২-২৫৫৭৩৩
মোবাইল : ৯৪৩৪৪৭৪৬৪৫

Sl. No. 146

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

জনগণের সেবায় নিয়োজিত

কালীমাতা রাইস মিল

দিগনগর, বর্ধমান

Sl. No. 145

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

তারা মা হিন্দু হোটেল

গোবিন্দপুর (দীঘা)

প্রোঃ সুশান্ত চ্যাটার্জী, দেবাশিস মুখার্জী

Sl. No. 143

With Best Compliments of

M/s SHYAMAPADA KARMAKAR

Govt. Contractor & General Order Supplier

Vill. & P.O. Kota, Burdwan

Sl. No. 144

With best compliments of

Saradamayee Rice Mill

Factory : 0342-2454228, 2454220

Sl. No. 42

With best compliments of

M/s Rakona Rice Mill

NH-2 (G.T. Road)
Rakona, Jharul, Galsi, Burdwan
Contact
Mill : 0342-2454569
Production : 9434100215, 9434108122
Sales : 9434225267, 9475375814, 9232380323

Sl. No. 43

With best compliments of

Sl. No. 48

With best compliments of

Astha Rice Mill (P) Ltd.

Village & P.O. Paraj, Dist. Burdwan-713403

CONTACT
FACTORY : (0342) 2454777
SALES: 9800515456, 9434198271
9153001144, 9732009513

Sl. No. 45

With best compliments of

Sl. No. 40

With best compliments of

brm
Bhadreswar Rice Mill
....WE CARE FOR YOUR HEALTH....

Bhadreswar Rice Mill

Paraj, Burdwan

Sl. No. 49

সকলকে শারদ শুভেচ্ছা জানাই

Paraj Trading Mini Rice Mill

NH-2 (G.T. Road), Paraj More, Galsi, Burdwan
Contact : (0342) 2454560 / 360 (Fact.)
(0342) 2664248 / 389 (Bdn. Office)

Sales : 9434008380, 9933390095, 9332298287

Sl. No. 46

শারদ অভিনন্দন গ্রহণ করুন

নূপুর রাইস মিল

পারাজ, গলসী, বর্ধমান
ফোন : ৯১২৬০৪৭২১৭

Sl. No. 47

Happy Pooja Greetings From

M&B TRADERS

GOVT. ELECTRICAL & INSTUMENTS CONTRACTOR
&
GENERAL ORDER SUPPLIERS

Govt. Electrical Licence No. 10241

Gopinathpur, Durgapur-713219
Mobile : 9434388056, 9474698366, 9434647573
E-mail : ashokghosh_dgp@rediffmail.com

Sl. No. 165

With best compliments of

SUPARNA TRADING

CONTRACTOR & EARTHMOVERS

REGD. OFFICE : 2/18, Derojio Path, SAIL Co-Operative
City Centre, Durgapur-713216, Phone : (0343) 2566021

CITY OFFICE : Urvashi Commercial Centre, 1st Floor, Unit No. 017
Bengal Ambuja Housing Dev. Ltd., City Centre, Durgapur-713216
Mobile : 93337 46254

Sl. No. 160

With best compliments of

PREM CONSTRUCTION

CIVIL CONTRACTOR

Durgapur

Sl. No. 164

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

কাটসিহি সমবায় সমিতি লি.

গ্রাম ও পোঃ কাটসিহি
রেজি. নং : ২৭৬৬ তারিখ : ২৫-১০-১৯৬১

চাষির সেবায় নিয়োজিত
কে.সি.সি. লোন, ব্যাঙ্কিং, সার ব্যবসা, সাবমার্সিবল দ্বারা
সেচের ব্যবস্থা ও কৃষিজ যন্ত্রপাতি সহজ শর্তে ঋণের
মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়।

Sl. No. 149

With best compliments of

S.R. CONSTRUCTION

Nazrulpalli, Dobrana, Bahula
Dist. Burdwan

Sl. No. 159

With best compliments of

M/S PRAKASH CONSTRUCTION

FABRICATOR, ERECTOR, MECHANICAL, CIVIL CONTRACTOR
&
GENERAL ORDER SUPPLIER

Qr. No. L/32, Sagarbhanga Colony, Durgapur-713211
Phone : 2558523, Mobile : 9332017271, 9932653994

Sl. No. 122

With best compliments of

M/S SREE KHAITAN TRADERS

Hattala Road, Durgapur-713201

Sl. No. 161

With best compliments of

JAI SHREE TIMBERS

M I L L
Amrasota More, Suri Road
P.O. Searsole Rajbari-713358
Phone : 0341-2444002
e-mail : jaishreetimebers@rediffmail.com

R E S I
18/1, N.S.B. Road
P.O. Raniganj (W.B.)
Phone : 0341-2449707
Fax : 0341-2444019

Sl. No. 128

শারদ শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

Rakona, P.O. Jharul, Burdwan

Sl. No. 41

With best compliments of

Sl. No. 50

With best compliments of

TARUN ENTERPRISE

CIVIL, MECHANICAL, CONTRACTOR & LABOUR SUPPLIERS

Satyajit Park, Sagarbhanga, Durgapur-12

BRANCH OFFICE
Sagarbhanga, Majhermore, Durgapur-11
Contact : 9851420895, 7407410009, 9851005884, 9333141510

Sl. No. 163